আল মুজাদালাহ

৫৮

নামকরণ

المجادلة এবং المجادلة উভয়টিই এ সূরার নাম। নামটি প্রথম আয়াতের تُجَادِلُكَ শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। সূরার প্রারম্ভেই যেহেতু সে মহিলার কথা উল্লেখ আছে, যে তার স্বামীর 'যিহারে'র ঘটনা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পেশ করে পীড়াপীড়ি করেছিল যে, তিনি যেন এমন কোন উপায় বলে দেন যাতে তার এবং তার সন্তানদের জীবন ধংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। আল্লাহ তা'আলা তার এ পীড়াপীড়িকে مجادله শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। তাই এ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। শব্দটিকে যদি مجادله পড়া হয় তাহলে তার অর্থ হবে "আলোচনা ও যুক্তি তর্ক" আর যদি مجادله পড়া হয় তাহলে অর্থ হবে "আলোচনা ও যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকারিনী।"

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

মুজাদালার এ ঘটনাটি কখন সংঘটিত হয়েছিল তা কোন রেওয়ায়াতেই স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়নি। কিন্তু এ সূরার বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন একটি ইংগিত আছে যার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করে বলা যায় যে, এ সূরা আহযাব যুদ্ধের (৫ম হিজরীর শাওয়াল মাস) পরে নাযিল হয়েছে। পালিত পুত্র যে প্রকৃতই পুত্র হয় না সে বিষয়ে বলতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা সূরা আহযাবে যিহার সম্পর্কে শুধু এতটুকু বলেছিলেন ঃ

وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰئِىْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ

"তোমরা যেসব স্ত্রীর সাথে যিহার করো আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের মা বানিয়ে দেননি।" (আল আহযাব ঃ ৪)

কিন্তু যিহার করা যে, একটি গোনাহ বা অপরাধ সেখানে তা বলা হয়নি। এ কাজের শরয়ী বিধান কি সেখানে তাও বলা হয়নি। পক্ষান্তরে এ সূরায় যিহারের সমস্ত বিধি-বিধান বলে দেয়া হয়েছে। এতে বুঝা যায় বিস্তারিত এ হুকুম আহকাম ঐ সংক্ষিপ্ত হিদায়াতের পরেই নাযিল হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সেসময় মুসলমানগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এ সূরায় সেসব সমস্যা সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সূরার শুরু থেকে ৬ নং আয়াত পর্যন্ত যিহারের শরয়ী

হুকুম আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। সে সাথে মুসলমানদের কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণ করার পরে জাহেলী রীতিনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ লংঘন করা অথবা তা মেনে চলতে অস্বীকার করা অথবা তার পরিবর্তে নিজের ইচ্ছা মাফিক অন্য নিয়ম নীতি ও আইন কানুন তৈরী করে নেয়া ঈমানের চরম পরিপন্থী কাজ ও আচরণ। এর শাস্তি হচ্ছে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা। এ ব্যাপারে আখেরাতেও কঠোর জবাবদিহি করতে হবে।

৭ থেকে ১০ আয়াতে মুনাফিকদের আচরণের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। তারা পরস্পর গোপন সলা পরামর্শ করে নানারূপ ক্ষতি সাধনের পরিকল্পনা করতো। তাদের মনে যে গোপন হিংসা বিদ্বেষ ছিল তার কারণে তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইহুদীদের মত এমন কায়দায় সালাম দিতো যা দ্বারা দোয়ার পরিবর্তে বদ দোয়া প্রকাশ পেতো। এ ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে এই বলে সান্তনা দেয়া হয়েছে যে, মুনাফিকদের ঐ সলা পরামর্শ তোমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে নিজেদের কাজ করতে থাক। সাথে সাথে তাদেরকে এই নৈতিক শিক্ষাও দেয়া হয়েছে যে, গোনাহ জুলুম বাড়াবাড়ি এবং নাফরমানির কাজে সলা পরামর্শ করা ঈমানদারদের কাজ নয়। তারা গোপনে বসে কোন কিছু করলে তা নেকী ও পরহেজগারীর কাজ হওয়া উচিত।

১১ থেকে ১৩ আয়াতে মুসলমানদের কিছু মজলিসী সভ্যতা ও বৈঠকী আদব-কায়দা শেখানো হয়েছে। তাছাড়া এমন কিছু সামাজিক দোষ-ত্রুটি দূর করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যা মানুষের মধ্যে আগেও ছিল এবং এখনো আছে। কোন মজলিসে যদি বহু সংখ্যক লোক বসে থাকে এমতাবস্থায় যদি বাইরে থেকে কিছু লোক আসে তাহলে মজলিসে পূর্ব থেকে বসে থাকা ব্যক্তিগণ নিজেরা কিছুটা গুটিয়ে বসে তাদের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার কষ্টটুকু স্বীকার করতেও রাজি হয় না। ফলে পরে আগমনকারীগণ দাঁড়িয়ে থাকেন, অথবা দহলিজে বসতে বাধ্য হয় অথবা ফিরে চলে যায় অথবা মজলিসে এখনো যথেষ্ট স্থান আছে দেখে উপস্থিত লোকজনকে ডিঙ্গিয়ে ভিতরে চলে আসেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে প্রায়ই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো। তাই আল্লাহ তা'আলা সবাইকে হিদায়াত বা নির্দেশনা দিয়েছেন যে, মজলিসে আত্মস্বার্থ এবং সংকীর্ণ মনের পরিচয় দিও না। বরং খোলা মনে পরবর্তী আগমনকারীদের জন্য স্থান করে দাও।

অনুরূপ আরো একটি ত্রুটি মানুষের মধ্যে দেখা যায়। কেউ করো কাছে গেলে বিশেষ করে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কাছে গেলে জেঁকে বসে থাকে এবং এদিকে মোটেই লক্ষ করে না যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নেয়া তার কষ্টের কারণ হবে। তিনি যদি বলেন, জনাব এখন যান তাহলে সে খারাপ মনে করবে। তাকে ছেড়ে উঠে গেলে অভদ্র আচরণের অভিযোগ করবে। ইশারা ইংগিতে যদি বুঝাতে চান যে, অন্য কিছু জরুরী কাজের জন্য তার এখন কিছু সময় পাওয়া দরকার তাহলে শুনেও শুনবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও মানুষের এ আচরণের সম্মুখীন হতেন আর তাঁর সাহচর্য থেকে উপকৃত হওয়ার আকাঙ্খায় আল্লাহর বান্দারা মোটেই খেয়াল করতেন না যে, তারা অতি মূল্যবান কাজের সময় নষ্ট করছেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ কষ্টদায়ক বদঅভ্যাস

পরিত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দিলেন যে, যখন বৈঠক শেষ করার জন্য উঠে যাওয়ার কথা বলা হবে তখন উঠে চলে যাবে।

মানুষের মধ্যে আরো একটি বদঅভ্যাস ছিল। তা হচ্ছে, কেউ হয়তো নবীর (সা) সাথে অযথা নির্জনে কথা বলতে চাইতো অথবা বড় মজলিসে তাঁর নিকটে গিয়ে গোপনীয় কথা বলার ঢংয়ে কথা বলতে চাইতো। এটি নবীর (সা) জন্য যেমন কষ্টদায়ক ছিল তেমনি মজলিসে উপস্থিত লোকজনের কাছে অপছন্দনীয় ছিল। তাই যে ব্যক্তিই নির্জনে একাকী তাঁর সাথে কথা বলতে চায় , আল্লাহ তা'আলা তার জন্য কথা বলার আগে সাদকা দেয়া বাধ্যতামূলক করে দিলেন। লোকজনকে তাদের এ বদঅভ্যাস সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। যাতে তারা এ বদঅভ্যাস পরিত্যাগ করে।

সুতরাং এ বাধ্যবাধকতা মাত্র অল্প কিছু দিন কার্যকর রাখা হয়েছিল। মানুষ তাদের কার্যধারা ও অভ্যাস সংশোধন করে নিলে এ নির্দেশ বাতিল করে দেয়া হলো।

মুসলিম সমাজের মানুষের মধ্যে নিস্বার্থ ঈমানদার, মুনাফিক এবং দোদুল্যমান তথা সিদ্ধান্তহীনতার রোগে আক্রান্ত মানুষ সবাই মিলে মিশে একাকার হয়েছিল। তাই কারো সত্যিকার ও নিস্বার্থ ঈমানদার হওয়ার মানদণ্ড কি তা ১৪ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত তা স্পষ্টভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। এক শ্রেণীর মুসলমান ইসলামের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে, সে যে দীনের ওপর ঈমান আনার দাবী করে নিজের স্বার্থের খাতিরে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতেও দ্বিধাবোধ করে না এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নানারকম সন্দেহ–সংশয় এবং দ্বিধা–দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর পথে আসতে বাধা দেয়। তবে যেহেতু তারা মুসলমানদের দলে অন্তরভূক্ত তাই ঈমান গ্রহণের মিথ্যা স্বীকৃতি তাদের জন্য ঢালের কাজ করে। আরেক শ্রেণীর মুসলমান তাদের দীনের ব্যাপারে অন্য কারো পরোয়া করা তো দূরের কথা নিজের বাপ, ভাই, সন্তান–সন্ততি এবং গোষ্ঠীকে পর্যন্ত পরোয়া করে না। তাদের অবস্থা হলো, যে আল্লাহ, রসূল এবং তার দীনের শত্রু তার জন্য তার মনে কোন ভালবাসা নেই। এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, প্রথম শ্রেণীর এই মুসলমানরা যতই শপথ করে তাদের মুসলমান হওয়ার নিশ্চয়তা দিক না কেন প্রকৃতপক্ষে তারা শয়তানের দলের লোক। সুতরাং শুধু দ্বিতীয় প্রকার মুসলমানগণই আল্লাহর দলে অন্তরভূক্ত হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে। তারাই খাঁটি মুসলমান। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই লাভ করবে সফলতা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ۝١ اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ؕ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔيْ وَلَدْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝٢

আল্লাহ অবশ্যই সে মহিলার কথা শুনেছেন[১] যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার কাছে কাকুতি মিনতি করেছে এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ করছে। আল্লাহ তোমাদের দু'জনের কথা শুনছেন[২] তিনি সবকিছু শুনে ও দেখে থাকেন।

তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে "যিহার" করে[৩] তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। তাদের মা কেবল তারাই যারা তাদেরকে প্রসব করেছে।[৪] এসব লোক একটা অতি অপছন্দনীয় ও মিথ্যা কথাই বলে থাকে।[৫] প্রকৃত ব্যাপার হলো, আল্লাহ মাফ করেন, তিনি অতীব ক্ষমাশীল।[৬]

১. এখানে শোনা অর্থ শুধুমাত্র শোনা নয়, বরং বিপদে সাহায্য করা। যেমন, আমরা সাধারণভাবে বলি, আল্লাহ দোয়া শুনেছেন। এর অর্থ আল্লাহ দোয়া কবুল করেছেন।

২. অনুবাদকগণ সাধারণভাবে এ স্থানে অনুবাদ করেছেন, মহিলা ঝগড়া করছিল, অভিযোগ করছিল। আর এ অনুবাদ পড়ে পাঠক এ অর্থ গ্রহণ করে যে, মহিলাটি তার অভিযোগ পেশ করে হয়তো চলে গিয়েছিল এবং পরে কোন এক সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল হয়েছিল। তাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি সে মহিলার কথা শুনেছি, যে তোমার কাছে অনুনয় বিনয় ও ফরিয়াদ করছিল। সে সময় আমি তোমাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনছিলাম। কিন্তু এ ঘটনা সম্পর্কে হাদীসসমূহে যেসব বর্ণনা আছে তার অধিকাংশ বর্ণনাতেই বলা হয়েছে, যে

সময় সেই মহিলা তার স্বামীর "যিহারের" ঘটনা শুনিয়ে নবীর (সা) কাছে বারবার এ বলে আবেদন করছিল যে, তাদের মধ্যে যদি বিচ্ছেদ হয়ে যায় তাহলে সে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে এবং তার সন্তান–সন্ততি ধ্বংস হয়ে যাবে। ঠিক এ সময়েই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল হওয়ার লক্ষণ পরিষ্ফুট হয়ে উঠলো এবং এ আয়াতগুলো নাযিল হলো। এ কারণে আমরা বর্তমান কাল বোধক শব্দ দিয়ে এর অনুবাদ করেছি।

যে মহিলা সম্পর্কে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল তিনি ছিলেন খাযরাজ গোত্রের খাওলা বিনতে সা'লাবা। তাঁর স্বামী ছিলেন আওস গোত্রের নেতা আওস ইবনে সামেত আনসারীর ভাই। তাঁর যিহারের ঘটনা আমরা পরে সবিস্তারে বর্ণনা করবো। এখানে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, আল্লাহর দরবারে এ সাহাবিয়ার অভিযোগ গৃহীত হওয়া এবং আল্লাহর তরফ থেকে সংগে সংগে তাঁর অভিযোগের প্রতিকার করে নির্দেশ নাযিল হওয়া ছিল এমন একটি ঘটনা যার কারণে সাহাবা কিরামের মধ্যে তিনি বিশেষ একটি সম্মান ও মর্যাদার স্থান লাভ করেছিলেন। ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত 'উমর (রা) কিছুসংখ্যক সংগী–সাথীর সাথে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে এক মহিলার সাথে দেখা হলে সে তাঁকে থামতে বললে তিনি সংগে সংগে থেমে গেলেন। মাথা নিচু করে দীর্ঘ সময় তার কথা শুনলেন এবং সে নিজে কথা শেষ না করা পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন। সংগীদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন, এ বুড়ীর জন্য আপনি কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে এত সময় থামিয়ে রেখেছেন কেন? তিনি বললেন ঃ সে কে তা কি জান? এ যে, খাওলা বিনতে সা'লাবা। এ তো সে মহিলা, সাত আসমানের ওপরে যার অভিযোগ গৃহীত হয়েছে। আল্লাহর কসম, তিনি যদি আমাকে সারা রাত দাঁড় করিয়ে রাখতেন তাহলে আমি সারা রাতই দাঁড়িয়ে থাকতাম। শুধু নামাযের সময় ওজর পেশ করতাম। ইবনে আব্দুল বার তাঁর 'ইসতিয়াব' গ্রন্থে কাতাদার একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, রাস্তায় হযরত 'উমরের (রা) সাথে এ মহিলার সাক্ষাত হলে তিনি তাঁকে সালাম দিলেন। সালামের জবাব দেয়ার পর তিনি বলতে থাকলেন ঃ "ওহ্ উমর এমন এক সময় ছিল যখন আমি তোমাকে "উকাযের" বাজারে দেখেছিলাম। তখন তোমাকে উমায়ের বলে ডাকা হতো। তখন তুমি লাঠি হাতে নিয়ে বকরী চরিয়ে বেড়াতে। এর অল্প দিন পর তোমাকে 'উমর' নামে ডাকা হতে থাকলো। অতপর এমন এক সময় আসলো যখন তোমাকে 'আমীরুল মু'মিনীন' বলে সম্বোধন করা শুরু হলো। প্রজাদের ব্যাপারে অন্তত কিছুটা আল্লাহকে ভয় করো। মনে রেখো, যে আল্লাহর আযাব সম্পর্কিত সাবধানবাণীকে ভয় পায় দূরের মানুষও তাঁর নিকটাত্মীয়ের মত হয়ে যায়। আর যে মৃত্যুকে ভয় পায় তার ব্যাপারে আশংকা হয় যে, সে এমন জিনিসও হারিয়ে ফেলবে যা সে রক্ষা করতে চায়।" হযরত উমরের (রা) সাথে ছিলেন জারুদ আবদী। একথা শুনে তিনি বললেন ঃ হে নারী, তুমি আমীরুল মু'মিনের সাথে অনেক বে–আদবী করেছো। হযরত 'উমর বললেন ঃ তাকে বলতে দাও। তুমি কি জান সে কে? তাঁর কথা তো সাত আসমানের ওপরে গৃহীত হয়েছিল। 'উমরকে (রা) তো তাঁর কথা শুনতেই হবে।' ইমাম বুখারীও (র) তাঁর লিখিত ইতিহাস গ্রন্থে সংক্ষেপে এ ঘটনার প্রায় অনুরূপ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন।

৩. আরবে অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটতো যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হলে স্বামী ক্রোধান্বিত হয়ে বলতো أَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّى এর আভিধানিক অর্থ হলো, "তুমি আমার জন্য ঠিক আমার মায়ের পিঠের মত" কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, আমার তোমার সাথে সহবাস ঠিক আমার মায়ের সাথে সহবাস করার মত। এযুগেও বহু নির্বোধ মানুষ স্ত্রীর সাথে ঝগড়া বিবাদ করে তাদের মা, বোন ও মেয়ের মত বলে ফেলে। এর স্পষ্ট অর্থ দাঁড়ায় স্বামী এখন আর তাকে স্ত্রী মনে করে না, বরং যেসব স্ত্রীলোক তার জন্য হারাম তাদের মত মনে করে। এরূপ করাকেই "যিহার" বলা হয়। ظهر আরবী ভাষায় রূপক অর্থে বাহনকে বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ সওয়ারী জন্তুকে ظهر বলা হয়। কেননা, মানুষ তার পিঠে আরোহণ করে। মানুষ যেহেতু স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করে নেয়ার উদ্দেশ্যে বলতো যে, তোমাকে ظهر বানানো আমার জন্য আমার মাকে ظهر বানানোর মতই হারাম। সুতরাং তাদের মুখ থেকে এসব কথা উচ্চারণ করাকেই তাদের ভাষায় 'যিহার' বলা হতো। জাহেলী যুগে আরবদের কাছে এটা তালাক বা তার চেয়ে অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা বলে মনে করা হতো। কারণ, তাদের দৃষ্টিতে এর অর্থ ছিল এই যে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্কই ছিন্ন করছে না বরং তাকে নিজের মায়ের মত হারাম করে নিচ্ছে। এ কারণে আরবদের মতে তালাক দেয়ার পর তা প্রত্যাহার করা যেতো। কিন্তু "যিহার" প্রত্যাহার করার কোন সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকতো না।

৪. এটা যিহার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার প্রথম ফায়সালা। এর অর্থ হলো, কেউ যদি মুখ ফুটে স্ত্রীকে মায়ের মত বলে বসে তাহলে তার বলার কারণে স্ত্রী তার মা হতে পারে না। কোন মহিলার কারো মা হওয়া একটা সত্য ও বাস্তব ব্যাপার। কারণ, সে তাকে প্রসব করেছে। এ কারণে সে স্থায়ীভাবে হারাম হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু যে নারী তাকে প্রসব করেনি, শুধু মৌখিক কথাতেই সে কিভাবে তার মা হয়ে যাবে? বুদ্ধি-বিবেক, নৈতিকতা এবং আইন কানুন যে কোন বিচারেই হোক সে কিভাবে প্রকৃত প্রসবকারিনী মায়ের মত হারাম হবে? আল্লাহ তা'আলা এভাবে এ কথাটি ঘোষণা করে সেসব জাহেলী আইন-কানুনকে বাতিল করে দিয়েছেন যার ভিত্তিতে যিহারকারী স্বামীর সাথে তার স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেতো এবং স্ত্রীকে স্বামীর জন্য মায়ের মত অলংঘনীয় হারাম মনে করা হতো।

৫. অর্থাৎ স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করা প্রথমত এমন একটি অর্থহীন ও লজ্জাজনক কথা যা মুখে উচ্চারণ করা তো দূরের কথা কোন শরীফ মানুষের যার কল্পনাও করা উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, এটি একটি মিথ্যা কথাও বটে। কারণ, যে এরূপ কথা বলছে সে যদি এর দ্বারা বুঝিয়ে থাকে যে, তার স্ত্রী এখন তার মা হয়ে গিয়েছে তাহলে সে মিথ্যা বলছে। আর সে যদি এ একথাটি তার সিদ্ধান্ত হিসেবে শুনিয়ে থাকে যে, আজ থেকে সে তার স্ত্রীকে মায়ের মর্যাদা দান করেছে তাহলেও তার এ দাবী মিথ্যা। কারণ, আল্লাহ তাকে অধিকার দেননি যে, যতদিন ইচ্ছা সে একজন নারীকে স্ত্রী হিসেবে রাখবে এবং যখন ইচ্ছা তাকে মায়ের মর্যাদা দান করবে। সে নিজে আইন রচয়িতা নয় বরং আইন রচয়িতা হলেন আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা প্রসবকারিনী মায়ের সাথে দাদী, নানী, শাশুড়ী, দুধমা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণকেও মাতৃত্বের মর্যাদা দান করেছেন।

وَالَّذِينَ يُظٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

যারা[৭] নিজের স্ত্রীর সাথে "যিহার" করে বসে এবং তারপর নিজের বলা সে কথা প্রত্যাহার করে[৮] এমতাবস্থায় তারা পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি ক্রীতদাসকে মুক্ত করতে হবে। এর দ্বারা তোমাদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে।[৯] তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।[১০]

নিজের স্ত্রীকে তো দূরের কথা নিজের পক্ষ থেকে অন্য কোন নারীকেও এ মর্যাদার অন্তরভুক্ত করার অধিকার কারোই নেই। একথা থেকে আরো একটি আইনগত বিধান যা পাওয়া যায় তাহলো, 'যিহার' করা একটি গুরুতর গোনাহ এবং হারাম কাজ। যে এ কাজ করবে সে শাস্তির উপযুক্ত।

৬. অর্থাৎ এটি এমন একটি কাজ যে জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কঠিন শাস্তি পাওয়া উচিত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার মেহেরবাণী যে, তিনি প্রথমত যিহারের ব্যাপারে জাহেলী আইন–কানুন বাতিল করে তোমাদের পারিবারিক জীবনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। দ্বিতীয়ত এ অপরাধে অপরাধী ব্যক্তির জন্য সর্বাধিক লঘু শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। তার সবচেয়ে বড় মেহেরবানী এই যে, জেল খাটা বা মারপিট অকারে এ অপরাধের শাস্তি বিধান করেননি। বরং এমন কিছু ইবাদাত ও নেকীর কাজকে এ অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত করেছেন যা তোমাদের প্রবৃত্তির সংশোধন করে এবং সমাজে কল্যাণ ও সুকৃতির বিস্তার ঘটায়। এ ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও বুঝা উচিত যে, কোন কোন অপরাধ ও গোনাহর জন্য যেসব ইবাদাতকে কাফ্ফারা নির্ধারণ করা হয়েছে তা ইবাদাতের চেতনাবিহীন নিরেট শাস্তি নয়। আবার নিছক এমন ইবাদাতও নয় যে, তার মধ্যে শাস্তির কষ্টকর কোন দিক আদৌ নেই। এর মধ্যে ইবাদাত ও শাস্তি উভয়টিই একত্রিত করা হয়েছে, যাতে ব্যক্তি যুগপত কষ্টও ভোগ করে এবং সাথে সাথে একটি ইবাদাত ও নেকীর কাজ করে তার কৃত গোনাহরও প্রতিকার করে।

৭. এখান থেকে যিহারের আইনগত আদেশ নিষেধ শুরু হয়েছে। এসব বিধি–বিধান সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যুগে যিহারের যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তা সামনে থাকা জরুরী। কেননা, যিহারের বিধি–বিধান সম্পর্কিত এসব আয়াত নাযিল হওয়ার পর সংঘটিত ঘটনাসমূহের ক্ষেত্রে নবী (সা) যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তা থেকেই ইসলামে যিহার সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধি–বিধান গৃহীত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুসারে আওস ইবনে সামেত আনসারীর ঘটনাই ইসলামে যিহার সম্পর্কিত সর্ব প্রথম ঘটনা। তাঁর স্ত্রী খাওলার ফরিয়াদের জওয়াবে

আল্লাহ তা'আলা এসব আয়াত নাযিল করেছেন। বিভিন্ন বর্ণনাকারীর নিকট থেকে মুহাদ্দিসগণ এ ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন তাতে অনেক খুঁটি নাটি মতভেদ আছে। তবে আইনগত গুরুত্ব বহন করে এরূপ উপাদান সম্পর্কে সবাই প্রায় একমত। এসব বর্ণনার সার কথা হলো, বৃদ্ধাবস্থায় হযরত আওস ইবনে সামেত কিছুটা খিটমিটে মেজাজের হয়ে গিয়েছিলেন। কোন কোন বর্ণনা অনুসারে তার মধ্যে কতকটা পাগলামী ভাব সৃষ্টি হয়েছিল। এ বিষয়টা বুঝানোর জন্য বর্ণনাকারীগণ كان به لمم বাক্য ব্যবহার করেছেন। আরবী ভাষায় لمم শব্দ দ্বারা পাগলামী বুঝানো হয় না, বরং এমন একটি অবস্থাকে বুঝানো হয় যাকে আমরা বাংলায় "ক্রোধে পাগল হয়ে যাওয়া" কথাটি দ্বারা বুঝিয়ে থাকি। এ অবস্থায় তিনি পূর্বেও কয়েকবার স্ত্রীর সাথে যিহার করেছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর সাথে ঝগড়া বিবাদ করে তার দ্বারা পুনরায় এ ঘটনা সংঘটিত হওয়া ছিল ইসলামে সর্ব প্রথম ঘটনা। এ ঘটনার পর তাঁর স্ত্রী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির হয় এবং পূরা ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন, হে আল্লাহর রসূল, আমার এবং আমার সন্তানাদির জীবনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার কোন অবকাশ আছে কি? নবী (সা) এর যে জওয়াব দিয়েছিলেন বিভিন্ন বর্ণনাকারী তা বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে উদ্ধৃত করেছেন। কোন কোন বর্ণনার ভাষা হলো, "এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত আমাকে কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি।" কোন কোন বর্ণনার ভাষা হলো, "আমার ধারণা, তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছো।" আবার কোন কোন বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, "তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছো।" এ জবাব শুনে তিনি কাকুতি ও আহাজারি করতে শুরু করলেন। তিনি বারবার নবীকে (সা) বললেন ঃ সে তো তালাকের শব্দ বলেনি। আপনি এমন কোন পন্থা বলুন যার দ্বারা আমি আমার সন্তানাদি এবং বুড়ো স্বামীর জীবন ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু নবী (সা) প্রতিবার তাকে একই জবাব দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে নবীর (সা) ওপর অহী নাযিল হওয়ার অবস্থা দেখা দিল এবং এ আয়াতগুলো নাযিল হলো। এরপর তিনি তাকে বললেন, কোন কোন বর্ণনা অনুসারে তার স্বামীকে ডেকে বললেন ঃ একটি ক্রীতদাসকে মুক্ত করতে হবে। সে এতে তার অক্ষমতা প্রকাশ করলে বললেন ঃ লাগাতার দুই মাস রোযা রাখতে হবে। সে বললো তার অবস্থা এমন যে, দিনে তিনবার পানাহার না করলে তার দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণতর হতে থাকে। তিনি বললেন ঃ তাহলে ৬০ জন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াতে হবে। সে বললো তার সে সামর্থ নেই। তবে আপনি যদি সাহায্য করেন তাহলে পারবো। তিনি তাকে ৬০ জন মিসকীনকে দু'বার খাওয়ানোর মত খাদ্য দিলেন। বিভিন্ন রেওয়ায়াতে প্রদত্ত এ খাদ্যের বিভিন্ন পরিমাণ বর্ণনা করা হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় আছে, নবী (সা) যে পরিমাণ খাদ্য দিয়েছিলেন হযরত খাওলা নিজেও তার স্বামীকে সে পরিমাণ খাদ্য দিয়েছিলেন যাতে তিনি কাফ্ফারা আদায় করতে পারেন (ইবনে জারীর, মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে আবী হাতেম)।

যিহারের দ্বিতীয় ঘটনা ছিল সালামা ইবনে সাখার বায়াদীর ঘটনা। তাঁর যৌন শক্তি ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে কিছু বেশী। রমযান মাস আসলে সে এই আশংকায় রমযানের শেষ অবধি সময়ের জন্য স্ত্রীর সাথে যিহার করলো যাতে রোযা অবস্থায় দিনের বেলায় অধৈর্যের কাজ করে না বসে। কিন্তু সে নিজের এ সংকল্প রক্ষা করতে পারেনি। এক রাতে সে স্ত্রীর কাছে চলে যায় এবং তারপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সব কিছু খুলে বলে। তিনি বললেন, একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করো। সে

বললো, আমার কাছে আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই যাকে আমি মুক্ত করতে পারি। তিনি বললেন, একাধারে দুই মাস রোযা রাখো। সে বললো, রোযা অবস্থায় অধৈর্য হয়েই তো আমি এ মসিবতে জড়িয়ে পড়েছি। নবী (সা) বললেন, তাহলে ৬০ জন মিসকীনকে খেতে দাও। সে বললো, আমি এত দরিদ্র যে, উপোস করে রাত কাটিয়েছি। তখন নবী (সা) বনী যুরাইকের যাকাত আদায়কারীর নিকট থেকে তাকে এতটা খাদ্য দিলেন যাতে সে তা ৬০ জন মিসকীনকে বন্টন করে দিতে পারে এবং নিজের সন্তানাদির প্রয়োজন পূরণ করার জন্যও কিছু রাখতে পারে। (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

নাম উল্লেখ না করে তৃতীয় ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করলো এবং কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বেই তার সাথে সহবাস করলো। পরে নবী (সা) এর কাছে এ বিষয়ের সমাধান জানতে চাইলে তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন কাফ্ফারা আদায় না করা পর্যন্ত স্ত্রীর নিকট থেকে দূরে থাকো। আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)।

চতুর্থ ঘটনাটি হলো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনলেন এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বোন সম্বোধন করে ডাকছে। এতে তিনি রাগান্বিতভাবে বললেন ঃ সে কি তোমার বোন? তবে এটিকে তিনি যিহার হিসেবে গণ্য করলেন না। (আবু দাউদ)

এ চারটি ঘটনার নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহে পাওয়া যায়। পরবর্তী আয়াতসমূহে কুরআন মজীদের 'যিহার' সম্পর্কিত যে নির্দেশ আছে এসব হাদীসের সাহায্যে তা ভালভাবে বুঝা যেতে পারে।

৮. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে, يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا । একথাটির শাব্দিক অনুবাদ হবে, "তারা যা বলেছে যদি সেদিকে ফিরে যায়" কিন্তু আরবী ভাষা ও বাকরীতি অনুসারে এর অর্থ নিরূপণে বড় রকমের মতভেদ হয়েছে।

এর একটি অর্থ হতে পারে, যিহারের শব্দাবলী একবার মুখ থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় তা বলবে। জাহেরিয়া, বুকাইর ইবনুল আশাজ্জ এবং ইয়াহইয়া ইবনে যিহাদ আল ফাররা এ অর্থের সমর্থক। আতা ইবনে আবী রাবাহর একটি মতও এর সমর্থন করে বলে বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের মতে একবার যিহার করলে তা ক্ষমার যোগ্য। তবে কেউ যদি বার বার তা করে তাহলে তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে। তবে দু'টি কারণে এ ব্যাখ্যা স্পষ্ট ভুল। একটি কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা যিহার অর্থহীন ও মিথ্যা কথা ঘোষণা করে তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। এখন একথা কি কল্পনা করা যায় যে, কেউ একবার মিথ্যা এবং অর্থহীন কথা বললে তা মাফ হবে কিন্তু দ্বিতীয়বার বললে শাস্তির উপযুক্ত হবে? এটি ভুল হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিহারকারী কোন লোককেই একথা জিজ্ঞেস করেননি যে, সে একবার যিহার করেছে না দুইবার।

এ আয়াতাংশের দ্বিতীয় অর্থ হলো, জাহেলী যুগে যেসব লোক এ কাজ করতে অভ্যস্ত ছিল তারা যদি ইসলামী যুগেও তা করে তাহলে এটা হবে তাদের শাস্তি। এক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, যিহার করা মূলত একটি শাস্তিযোগ্য কাজ। যে ব্যক্তিই তার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে মুখ থেকে যিহারের শব্দাবলী উচ্চারণ করবে সে পরে তার স্ত্রীকে তালাক দিক বা তার স্ত্রী মারা

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّتَمَاسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۚ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ④

যে মুক্ত করার জন্য কোন ক্রীতদাস পাবে না সে বিরতিহীনভাবে দুই মাস রোযা রাখবে—উভয়ে পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বেই। যে তাও পারবে না সে ষাট জন মিসকীনকে খাবার দেবে।[১১]

তোমাদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এ জন্য যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনো।[১২] *এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত 'হদ'। কাফেরদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।*[১৩]

যাক কিংবা সে তার স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক রক্ষা না করার সংকল্প করুক তাতে কিছু আসে যায় না। সর্বাবস্থায় তাকে কাফ্‌ফারা দিতে হবে। ফকীহদের মধ্যে তাউস, মুজাহিদ, শা'বী, যুহরী, সুফিয়ান সাওরী এবং কাতাদা এমত পোষণ করেছেন। তাঁদের মতে, যিহার করার পর স্ত্রী যদি মারা যায় তাহলে কাফ্‌ফারা আদায় না করা পর্যন্ত স্বামী তার পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে না।

এ আয়াতাংশের তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, যিহারের শব্দাবলী মুখ থেকে উচ্চারণের পর ব্যক্তি যা বলেছে তা প্রত্যাহার করে এবং যদি তার প্রতিকার করতে চায়। অন্য কথায় عَادَ لِمَا قَالَ অর্থ সে যদি তার কথা থেকে ফিরে যায়।

এর চতুর্থ অর্থ হলো, যিহার করার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার জন্য যে জিনিস হারাম করে নিয়েছিল তা যদি আবার নিজের জন্য হালাল করে নিতে চায়। অন্য কথায় عَادَ لِمَا قَالَ এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি হারাম করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এখন সে পুনরায় তা হালাল করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অধিকাংশ ফিকাহবিদ শেষোক্ত দু'টি অর্থের মধ্যে যে কোন একটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

৯. অন্য কথায় তোমাদেরকে শিষ্ট ও ভদ্র আচরণ শিখানোর জন্য এ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যাতে মুসলিম সমাজের মানুষ এ জাহেলী কু আচরণ পরিত্যাগ করে এবং তোমাদের মধ্য থেকে কেউই যেন এ অর্থহীন কাজ না করে। যদি স্ত্রীর সাথে বিবাদ না করে কোন উপায় না থাকে তাহলে সভ্য ও রুচিশীল মানুষের মত বিবাদ করো। যদি তালাকই দিতে হয় তাহলে সরাসরি তালাক দিয়ে দাও। স্ত্রীর সাথে বিবাদ হলে তাকে মা অথবা বোন বানিয়ে ছাড়তে হবে এটা কি ধরনের ভদ্রতা ?

১০. অর্থাৎ কেউ যদি বাড়িতে স্ত্রীর সাথে চুপে চুপে যিহার করে বসে এবং পরে কাফ্ফারা আদায় করা ছাড়াই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আগের মতই দাম্পত্য সম্পর্ক চলতে থাকে তাহলে সে সম্পর্কে দুনিয়াতে কেউ অবহিত থাক আর না থাক আল্লাহ সর্বাবস্থায়ই তা জানেন। তার জন্য আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়।

১১. এটি যিহার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। মুসলিম ফিকাহবিদগণ এ আয়াতের শব্দাবলী, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিদ্ধান্তসমূহ এবং ইসলামের সাধারণ নীতিমালা থেকে এ বিষয়ে যেসব আইন-কানুন রচনা করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ আরব জাহেলিয়াতের যেসব রসম-রেওয়াজ অনুসারে যিহার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দিত এবং স্ত্রী স্বামীর জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যেতো যিহার সম্পর্কিত এসব ইসলামী আইন-কানুন তা বাতিল করে দেয়। অনুরূপভাবে যেসব আইনকানুন ও রসম-রেওয়াজ যিহারকে অর্থহীন ও প্রতিক্রিয়াহীন মনে করে এবং স্ত্রীকে মা কিংবা বিয়ে করা হারাম এমন মহিলাদের সাথে তুলনা করা সত্ত্বেও স্বামী তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখা বৈধ করে দেয় ইসলামী আইন-কানুন সে সবকেও বাতিল করে দেয়। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে মা এবং বিয়ে করা হারাম এমন অন্য সব মহিলার হারাম হওয়ার ব্যাপারটা মামুলি কোন বিষয় নয়। তাই স্ত্রী এবং তাদের মধ্যে তুলনা করার বিষয়টা মুখে উচ্চারণ করা তো দূরের কথা তা কল্পনাও করা যায় না। এ ব্যাপারে দু'টি চরম পন্থার মধ্যে ইসলামী আইন যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা তিনটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম ভিত্তি হলো, যিহার দ্বারা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয় না। বরং মহিলা যথারীতি স্বামীর স্ত্রীই থাকে। দ্বিতীয় ভিত্তি হলো, যিহার দ্বারা স্ত্রী সাময়িকভাবে স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায়। তৃতীয় ভিত্তি হলো, স্বামী কাফ্ফারা আদায় না করা পর্যন্ত এই 'হুরমত' অবশিষ্ট থাকে এবং শুধু কাফ্ফারাই এই 'হুরমত' রহিত করতে পারে।

দুই ঃ যিহারকারী স্বামী সম্পর্কে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, যে স্বামী সুস্থ বুদ্ধি ও প্রাপ্ত বয়স্ক এবং সুস্থ ও সজ্ঞানে যিহারের শব্দাবলী মুখ থেকে উচ্চারণ করবে কেবল তার যিহার গ্রহণযোগ্য হবে। শিশু ও বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির যিহার গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া যিহারের শব্দাবলী উচ্চারণের সময় যার বিবেক-বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক সুস্থ নাই তার যিহারও গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন, কেউ ঘুমন্ত অবস্থা অস্ফুট স্বরে কিছু বললো অথবা কোন প্রকার সংজ্ঞাহীনতায় আক্রান্ত হলো। এগুলো ছাড়া নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহে ফিকাহবিদদের মতভেদ আছে ঃ

(ক) নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যিহারকারী সম্পর্কে চার ইমামসহ ফিকাহবিদদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মত হচ্ছে, কেউ যদি জেনে শুনে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে তাহলে তালাকের মত তার যিহারও আইনত সঠিক বলে ধরে নেয়া হবে। কারণ সে নিজেই নিজের ওপর এ অবস্থা চাপিয়ে নিয়েছে। তবে কেউ যদি রোগের জন্য কোন ওষুধ ব্যবহার করে এবং তা দ্বারা নেশা ও মাদকতা সৃষ্টি হয়ে থাকে অথবা তীব্র পিপাসায় জীবন রক্ষার জন্য শরাব পান করতে বাধ্য হয়ে থাকে তবে এভাবে সৃষ্ট নেশায় তার যিহার ও তালাক কার্যকর করা হবে না। হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীগণ এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। সাধারণভাবে সাহাবা কিরামের মতও এটিই ছিল। পক্ষান্তরে হযরত

উসমানের (রা) মত হলো, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তালাক ও যিহার গ্রহণযোগ্য নয়। হানাফীদের মধ্য থেকে ইমাম তাহাবী (র) ও কারখী (র) এ মতটিকে অগ্রাধিকার দান করেন এবং ইমাম শাফেয়ীর (র) একটি মতও এর সমর্থন করে। মালেকীদের মতে ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণরূপে বিচার বুদ্ধি খুইয়ে না বসে বরং সংলগ্ন ও সাজানো গোছানো কথাবার্তা বলতে থাকে এবং কি বলছে সে উপলব্ধি থাকে তাহলে নেশাগ্রস্ত অবস্থার যিহারও গ্রহণযোগ্য হবে।

(খ) ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মালেকের (র) মতে কেবল মুসলমান স্বামীর যিহারই গ্রহণযোগ্য হবে। যিহার সম্পর্কিত এসব বিধি-নিষেধ যিম্মিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। কারণ কুরআন মজীদে الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم বলে মুসলমানদের সম্বোধন করা হয়েছে। তাছাড়া কুরআন মজীদে যিহারের যে তিন প্রকার কাফ্‌ফারার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে রোযাও অন্তরভুক্ত আছে। একথা স্পষ্ট যে, রোযা যিম্মীদের জন্য প্রয়োজ্য হতে পারে না। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে এসব আদেশ নিষেধ যিম্মী ও মুসলমান উভয়ের যিহারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। তবে যিম্মীদের রোযা রাখতে হবে না। তারা শুধু একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করবে অথবা ৬০ জন মিসকীনকে খেতে দেবে।

(গ) পুরুষের মত নারীও কি যিহার করতে পারে? যেমন ঃ সে যদি স্বামীকে বলে, তুমি আমার জন্য আমার বাপের মত অথবা আমি তোমার জন্য তোমার মায়ের মত তাহলে কি তা 'যিহার' বলে গণ্য হবে? চার ইমামের মতে এটা যিহার হবে না এবং এক্ষেত্রে যিহারের আইনগত বিধি বিধান আদৌ প্রযোজ্য হবে না। কেননা, স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে যিহার করে কেবল তখনই এই বিধি নিষেধ প্রযোজ্য হবে বলে কুরআন মজীদ স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِم) এবং যিহার করার ইখতিয়ার কেবল তারই থাকবে যার তালাক দেয়ার অধিকার আছে। ইসলামী শরীয়াত স্বামীকে তালাক দেয়ার ইখতিয়ার যেমন স্ত্রীকে দেয় নি ঠিক তেমনি নিজেকে স্বামীর জন্য হারাম করে নেয়ার ইখতিয়ারও দেয়নি। সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক ইবনে রাহাবিয়া, আবু সাওর এবং লাইস ইবনে সা'দ এমতটিই পোষণ করেছেন। তাদের মতে, স্ত্রীর এরূপ কথা অযথা ও অর্থহীন। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, এতে যিহার হবে না। তবে এর দ্বারা স্ত্রীর ওপর কসমের কাফ্‌ফারা দেয়া অত্যাবশ্যকীয় হবে। কারণ স্ত্রীর একথা বলার অর্থ হচ্ছে সে তার স্বামীর সাথে সম্পর্ক না রাখার শপথ করেছে। ইবনে কুদামাহ উদ্ধৃত করেছেন যে, এটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (র)ও মত। ইমাম আওযায়ী (র) বলেন, স্ত্রী যদি বিয়ে হওয়ার আগে একথা বলে থাকে যে, তার যদি অমুক ব্যক্তির সাথে বিয়ে হয় তাহলে সে তার জন্য তার বাপের মত তবে তা যিহার বলে গণ্য হবে। আর যদি বিয়ের পরে বলে থাকে তাহলে কসম বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে শুধু কসমের কাফ্‌ফারা দিতে হবে। তবে কাফ্‌ফারা আদায়ের পূর্বে স্বামীকে কাছে আসতে বাধা দেয়ার কোন অধিকার নারীর থাকবে না। এর সমর্থনে ইবরাহীম নাখয়ী একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হলো, তালহার (রা) কন্যা আয়েশাকে বিয়ে করার জন্য হযরত যুবায়েরের পুত্র মুসআব প্রস্তাব দিলে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে; আমি যদি তাকে বিয়ে করি তাহলে هو علي كظهر ابي সে আমার জন্য আমার পিতার পিঠের মত। এর কিছুকাল পর সে

তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে সম্মত হয়। এ ব্যাপারে মদীনার উলামাদের নিকট থেকে ফতোয়া চাওয়া হলে বহু সংখ্যক ফকীহ ফতোয়া দিলেন যে, আয়েশাকে যিহারের কাফ্ফারা দিতে হবে। এসব ফকীহদের মধ্যে কয়েকজন সাহাবীও অন্তরভুক্ত ছিলেন। এ ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত ইবরাহীম নাখয়ী মত প্রকাশ করেছেন যে, আয়েশা যদি বিয়ের পর একথা বলতেন তাহলে কাফ্ফারা দিতে হতো না। কিন্তু তিনি এ কথা বলেছিলেন বিয়ের পূর্বে, যখন তাঁর বিয়ে করা বা না করার অধিকার ছিল তাই তার ওপর কাফ্ফারা দেয়া ওয়াজিব।

তিন ঃ সুস্থ বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি যদি সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে যিহারের শব্দাবলী মুখ থেকে উচ্চারণ করে এবং পরে যুক্তি দেখিয়ে বলে যে, সে ক্রুদ্ধ হয়ে হাসি তামাসা করে অথবা আদর সোহাগ করে এরূপ বলেছে কিংবা তার যিহারের নিয়ত ছিল না তাহলে এ ওজর গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে যেসব শব্দ থেকে স্পষ্টভাবে যিহার বুঝায় না এবং যেসব শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থের অবকাশ আছে সেসব শব্দের ধরন ও প্রকৃতির ওপর তার সিদ্ধান্ত নির্ভর করে। যিহারের স্পষ্ট শব্দ কোন্গুলো এবং অস্পষ্ট শব্দ কোন্গুলো সে সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করবো।

চার ঃ এটা সর্বসম্মত ব্যাপার যে, বিবাহিত স্ত্রীর সাথেই কেবল যিহার করা যায়। অতএব স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন নারীর সাথে যিহার করা যায় কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন মত নিম্নরূপ ঃ

হানাফীদের মতে কেউ যদি অপর কোন নারীকে বলে, "আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি তাহলে তুমি আমার জন্য ঠিক আমার মায়ের পিঠের মত।" এক্ষেত্রে সে যখনই তাকে বিয়ে করুক না কেন কাফ্ফারা আদায় করা ছাড়া তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এটি হযরত 'উমরের (রা)ও ফতোয়া। তাঁর খিলাফত যুগে এক ব্যক্তি এক মহিলাকে একথা বলেছিল এবং পরে তাকে বিয়ে করেছিল। হযরত উমর (রা) বললেন, তাকে যিহারের কাফ্ফারা দিতে হবে।

মালেকী এবং হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীগণও এ কথাই বলেন। এর সাথে তারা অতিরিক্ত এতটুকু সংযোজিত করেন যে, যদি নির্দিষ্ট করে কোন মহিলার কথা না বলে এভাবে বলে যে, সমস্ত নারীই আমার জন্য এরূপ, এমতাবস্থায় সে যে নারীকেই বিয়ে করুক না কেন তাকে স্পর্শ করার আগেই কাফ্ফারা দিতে হবে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, উরওয়া ইবনে যুবায়ের, আতা ইবনে আবী রাবাহ, হাসান বাসরী এবং ইসহাক ইবনে রাহাবিয়া এমতটিই পোষণ করেছেন।

শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহদের মতে, বিয়ের পূর্বে যিহার অর্থহীন। ইবনে আব্বাস এবং কাতাদাও এ মতটিই পোষণ করেন।

পাঁচ ঃ যিহার কি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হতে পারে? হানাফী এবং শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহদের মতে, কেউ যদি নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করে যিহার করে তাহলে সেই সময়ের মধ্যে স্ত্রীকে স্পর্শ করলে কাফ্ফারা দিতে হবে। তবে সেই সময় অতিক্রান্ত হলে যিহার অকার্যকর হয়ে পড়বে। এর প্রমাণ সালামা ইবনে সাখার বায়াদীর ঘটনা। তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে রমযান মাসের জন্য যিহার করেছিলেন কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম তাকে বলেননি যে, সময় নির্দিষ্ট করা অর্থহীন। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক এবং ইবনে আবী লায়লা বলেন ঃ যিহার যখনই করা হোক না কেন তা সব সময়ের জন্য হবে। এক্ষেত্রে সময় নির্দিষ্ট করার কোন কার্যকারিতা থাকবে না। কারণ, যে 'হুরমত' কার্যকর হয়েছে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে তা আপনা থেকেই শেষ হয়ে গিয়েছে।

ছয় ঃ শর্তযুক্ত যিহার করা হয়ে থাকলে যখনই শর্ত ভঙ্গ হবে কাফ্ফারা দিতে হবে। যেমন ঃ কেউ যদি স্ত্রীকে বলে, "আমি যদি ঘরে প্রবেশ করি তাহলে তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত" এমতাবস্থায় সে যখনই ঘরে প্রবেশ করবে কাফ্ফারা আদায় করা ছাড়া সে স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারবে না।

সাত ঃ একই স্ত্রীর উদ্দেশ্যে কয়েকবার যিহারের শব্দাবলী বলা হয়ে থাকলে তা একই বৈঠকে বলা হয়ে থাক বা ভিন্ন ভিন্ন বৈঠকে বলা হয়ে থাক, সর্বাবস্থায়ই তা যতবার বলা হয়েছে ততবার কাফ্ফারা দিতে হবে। তবে যিহারের শব্দাবলী ব্যবহারকারী যদি তা একবার ব্যবহার করার পর শুধু পূর্বের কথার ওপর জোর দেয়ার উদ্দেশ্যে তা বারবার বলে তাহলে ভিন্ন কথা। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন ঃ কথাটি বারবার বলার নিয়তে বলা হোক কিংবা জোর দেয়ার জন্য বলা হোক, যতবারই বলা হোক না কেন সেজন্য একবারই কাফ্ফারা দিতে হবে।। শা'বী, তাউস, আতা ইবনে আবী রাবাহ, হাসান বাসরী এবং আওযায়ী রাহিমাহুমুল্লাহ এ মতেরই অনুসারী। এ বিষয়ে হযরত আলীর ফতোয়া হলো, কথাটি যদি একই বৈঠকে বার বার বলা হয়ে থাকে তাহলে সেজন্য একবার মাত্র কাফ্ফারা দিতে হবে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বৈঠকে বলা হলে যত সংখ্যক বৈঠকে বলা হয়েছে ততবার কাফ্ফারা দিতে হবে। এটি কাতাদা এবং আ'মর ইবনে দীনারেরও মত।

আট ঃ দুই বা দু'য়ের অধিক সংখ্যক স্ত্রীর সাথে একসাথে যিহার করা হলে, যেমন ঃ স্বামী তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললো যে, তোমরা আমার জন্য ঠিক আমার মায়ের পিঠের মত, তাহলে হানাফী ও শাফেয়ীদের মতে, প্রত্যেককে হালাল করার জন্য আলাদা আলাদা কাফ্ফারা দিতে হবে। এটি হযরত 'উমর (রা), হযরত আলী (রা), উরওয়া ইবনে যুবায়ের, তাউস, আতা, হাসান বাসরী, ইবরাহীম নাখয়ী, সুফিয়ান সাওরী এবং ইবনে শিহাব যুহরীর মত। ইমাম মালেক (র) এবং ইমাম আহমদ (র) বলেন, এক্ষেত্রে সবার জন্য একবারই কাফ্ফারা দিতে হবে। রাবীয়া, আওযায়ী, ইসহাক ইবনে রাহাবিয়া এবং আবু সাওরও এমতের অনুসারী।

নয় ঃ কেউ যদি এক যিহারের কাফ্ফারা দেয়ার পর পুনরায় যিহার করে বসে তাহলে পুনরায় কাফ্ফারা দেয়া ছাড়া স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না।

দশ ঃ কেউ যদি কাফ্ফারা দেয়ার আগেই স্ত্রীকে স্পর্শ করে বসে তাহলে চার ইমামের মতে, যদিও একাজ গোনাহ কিন্তু তাকে একটি কাফ্ফারাই দিতে হবে। তবে তার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত এবং পুনরায় এ কাজ না করা উচিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যারা এরূপ করেছিল তিনি তাদের বলেছিলেন ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং যতক্ষণ কাফ্ফারা না দিবে ততক্ষণ স্ত্রী থেকে আলাদা থাকো। কিন্তু এজন্য তিনি যিহারের কাফ্ফারা ছাড়া আর কোন কাফ্ফারা দিতে হবে বলে নির্দেশ দেননি।

হযরত আমর ইবনুল আস, কাবিসা ইবনে যুয়াইব, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, যুহরী এবং কাতাদা বলেন, তাকে দুইটি কাফ্ফারা দিতে হবে। এবং হাসান বাসরী ও ইবরাহীম নাখয়ীর মতে তিনটি কাফ্ফারা দিতে হবে। এ বিষয়ে যেসব হাদীসে নবীর (সা) ফায়সালা বর্ণিত হয়েছে উক্ত মনিষীদের কাছে সম্ভবত সে সব হাদীস পৌছেনি।

এগার ঃ স্ত্রীকে কাদের সাথে তুলনা করলে যিহার হবে? এ বিষয়ে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে ঃ

আমের শা'বী বলেন, কেবলমাত্র মায়ের সাথে তুলনা করলেই যিহার হবে। জাহেরিয়াগণ বলেন ঃ মায়েরও শুধু পিঠের সাথে তুলনা করলে যিহার হবে। অন্য কোন কথার ওপর এ নির্দেশ প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু এ বিষয়ে ফিকাহবিদদের কোন গোষ্ঠীই তাঁর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেননি। কারণ, মায়ের সাথে স্ত্রীর তুলনা করাকে কুরআন কর্তৃক গোনাহর কাজ বলার কারণ হলো, এটা একটা চরম অর্থহীন ও মিথ্যা কথা। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, যেসব নারী মায়ের মতই হারাম, তাদের সাথে স্ত্রীকে তুলনা করা অর্থহীনতা ও মিথ্যাবাদিতার দিক থেকে এর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তাই মায়ের সাথে তুলনা করার ক্ষেত্রে যে বিধান প্রয়োজ্য এ ক্ষেত্রেও সেই একই বিধান প্রযোজ্য না হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না।

হানাফীদের মতে যেসব নারী বংশ, দুগ্ধদান অথবা দাম্পত্য সম্পর্কের কারণে কারো জন্য চিরস্থায়ী হারাম তারা সবাই এ বিধানের অন্তরভুক্ত। কিন্তু যেসব নারী অস্থায়ীভাবে হারাম এবং যে কোন সময় হালাল হতে পারে তারা এর অন্তরভুক্ত না। যেমন, স্ত্রীর বোন, খালা, ফুফু অন্যান্য নারী যারা তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নয়। চিরস্থায়ী হারাম মহিলাদের মধ্য থেকে কোন মহিলার যে অংগের প্রতি দৃষ্টিপাত করা কারো জন্য হালাল নয় তার সাথে তুলনা করাই যিহার বলে গণ্য হবে। তবে স্ত্রীর হাত, পা, মাথা, চুল, দাঁত ইত্যাদিকে চিরস্থায়ী হারাম নারীর পিঠের সাথে অথবা স্ত্রীকে তার মাথা, হাত ও পায়ের মত দৈহিক অংগ-প্রত্যাংগের সাথে তুলনা করা যিহার বলে গণ্য হবে না। কারণ, মা ও বোনের এসব অংগ প্রত্যাংগের প্রতি তাকানো হারাম নয়। অনুরূপভাবে তোমার হাত আমার মায়ের হাতের মত অথবা তোমার পা আমার মায়ের পায়ের মত বলায় যিহার হবে না।

শাফেয়ীদের মতে, কেবল সেসব নারীই এ নির্দেশের অন্তরভুক্ত হবে যারা চিরদিন হারাম ছিল এবং চিরদিন হারাম থাকবে। অর্থাৎ মা, বোন, মেয়ে ইত্যাদি। কিন্তু যেসব নারী কোন সময় হালাল ছিল যেমন, দুধ মা, দুধ বোন, শাশুড়ী এবং পুত্রবধু অথবা যে সব নারী কোন সময় হালাল হতে পারে যেমন শ্যালিকা। এসব বিশেষ কারণে হারাম বা সাময়িক ও অস্থায়ী হারাম নারী ছাড়া স্থায়ী হারাম নারীদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা দেখানোর জন্য সাধারণত যে সব অংগের কথা উল্লেখ করা হয় না স্ত্রীকে যদি সেসব অংগের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে তা যিহার বলে গণ্য হবে। তবে যেসব অংগ- প্রত্যাংগের উল্লেখ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য করা হয় তার সাথে তুলনা করা কেবল তখনই যিহার হবে যখন তা যিহারের নিয়তে বলা হবে। যেমন, স্ত্রীকে একথা বলা তুমি আমার মায়ের চোখ অথবা জানের মত অথবা মার হাত অথবা পা অথবা পেটের মত, অথবা মায়ের পেট অথবা বক্ষস্থলের সাথে স্ত্রীর পেট অথবা বক্ষস্থলের সাথে তুলনা

করা, অথবা স্ত্রীর মাথা, পিঠ অথবা হাতকে নিজের জন্য মায়ের হাতের মত মনে করা, অথবা স্ত্রীকে একথা বলা যে, তুমি আমার জন্য আমার মায়ের মত। এসব কথা যদি যিহারের নিয়তে বলা হয়ে থাকে তাহলে যিহার হবে, আর যদি সম্মান দেখানোর নিয়তে বলা হয়ে থাকে তাহলে সম্মান প্রদর্শনই হবে।

মালেকীগণ বলেন, যেসব নারী পুরুষের জন্য হারাম তাদের সাথে স্ত্রীকে তুলনা করাই যিহার। এমন কি তাদের মতে, স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার জন্য অমুক পরনারীর পিঠের মত তাহলে তাও যিহারের সংজ্ঞায় পড়ে। তারা আরো বলেন, মা এবং চিরস্থায়ী হারাম মহিলাদের কোন অংগের সাথে স্ত্রীকে কিংবা স্ত্রীর কোন অংগকে তুলনা করা যিহার। এক্ষেত্রে এমন কোন শর্ত নেই যে, সেসব অংগ এমন হতে হবে যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হালাল নয়। কারণ স্ত্রীর প্রতি যেভাবে দৃষ্টিপাত করা হয় সেভাবে মায়ের কোন অংগের প্রতিই দৃষ্টিপাত করা হালাল নয়।

হাম্বলী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ হারাম মহিলাদের সবাইকে এ নির্দেশের অন্তরভুক্ত বলে মনে করেন। তারা চাই স্থায়ী হারাম হোক অথবা ইতিপূর্বে কখনো হালাল ছিল এখন চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে গিয়েছে। যেমন ঃ শাশুড়ী ও দুধমা। তবে যেসব মহিলা পরবর্তী কোন সময় হালাল হতে পারে যেমন ঃ শ্যালিকা। তাদের ব্যাপারে ইমাম আহমদের একটি মত হলো, তাদের সাথে তুলনা করাও যিহার হবে। দ্বিতীয় মতটি হলো, তাদের সাথে তুলনা করলে যিহার হবে না। তাছাড়াও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীদের মতে স্ত্রীর কোন অংগকে হারাম মেয়েদের কোন অংগের সাথে তুলনা করা যিহারের সংজ্ঞায় পড়ে। তবে চুল, নখ ও দাঁতের মত শরীরের অস্থায়ী অংগসমূহ এ নির্দেশের বহির্ভূত।

বার ঃ এ ব্যাপারে সমস্ত ফিকাহবিদগণ একমত যে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত" তাহলে তা স্পষ্ট যিহার হবে। কারণ, আরবদের মধ্যে এটাই যিহারের নিয়ম হিসেবে প্রচলিত ছিল। আর এ বিষয়টি সম্পর্কেই কুরআনের নির্দেশ নাযিল হয়েছে। অন্য সব বাক্যের কোন্‌টি দ্বারা স্পষ্ট যিহার হবে আর কোন্‌টি দ্বারা যিহার হবে না, বরং সেক্ষেত্রে যিহার হওয়া না হওয়ার সিদ্ধান্ত বক্তার নিয়ত অনুসারে করা হবে। এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে।

হানাফীদের মতে, যেসব বাক্য দ্বারা হালাল নারীকে (স্ত্রী) স্পষ্টভাবে হারাম নারীর (স্থায়ী হারাম নারীদের কোন একজন) সাথে তুলনা করা হয়েছে, অথবা যে অংগের দিকে দৃষ্টিপাত করা হালাল নয় এমন অংগের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেমন, কেউ তার স্ত্রীকে বললো ঃ তুমি আমার জন্য মা অথবা অমুক হারাম নারীর পেট অথবা উরুর মত। এছাড়া অন্য সব বাক্য সম্পর্কে মতভেদ করার অবকাশ আছে। কেউ যদি বলে ঃ "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত হারাম। ইমাম আবু হানীফার মতে এটা স্পষ্ট যিহার। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে এক্ষেত্রে যিহারের নিয়ত থাকলে যিহার হবে এবং তালাকের নিয়ত থাকলে তালাক হবে। যদি বলে, তুমি যেন আমার মা অথবা আমার মায়ের মত তাহলে এক্ষেত্রে সাধারণভাবে হানাফীদের ফতোয়া হলো, যিহারের নিয়তে একথা বলা হয়ে থাকলে যিহার হবে, এবং তালাকের নিয়তে বলা হয়ে থাকলে বায়েন তালাক হবে এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে বলা হয়ে থাকলে অর্থহীন

বাক্য হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদের মতে এটা অকাট্যভাবে যিহার। কেউ যদি স্ত্রীকে মা অথবা বোন অথবা কন্যা বলে সম্বোধন করে তাহলে এটা চরম অর্থহীন ও বাজে কথা। এরূপ কথায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাকে যিহার বলে গণ্য করেন নি। কেউ যদি বলে "তুমি আমার জন্য মায়ের মতই হারাম" যদি যিহারের নিয়তে বলে তাহলে যিহার হবে, তালাকের নিয়তে বললে তালাক হবে। আর কোন নিয়ত না থাকলে যিহার হবে। যদি বলে "তুমি আমার জন্য মায়ের অনুরূপ অথবা মায়ের মত" তাহলে উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। যদি সম্মান ও মর্যাদা বুঝানোর জন্য বলে থাকে তাহলে সম্মান মর্যাদা দেখানো বলে গণ্য করা হবে। যিহারের নিয়তে বলা হয়ে থাকলে যিহার হবে। তালাকের নিয়তে বলে থাকলে তালাক হবে। কোন নিয়ত না থাকলে এবং এমনি বলে থাকলে ইমাম আবু হানীফার মতে অর্থহীন কথা হবে, ইমাম আবু ইউসুফের মতে তাকে যিহারের কাফ্ফারা দিতে হবে না তবে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে এবং ইমাম মুহাম্মাদের মতে যিহার হবে।

শাফেয়ী ফিকাহবিদদের মতে যিহারের স্পষ্ট বাক্য হলো 'তুমি আমার কাছে অথবা আমার সংগে অথবা আমার জন্যে আমার মায়ের পিঠের মত, অথবা তুমি আমার মায়ের পিঠের মত। অথবা তোমার দেহ বা শরীর অথবা তোমার সত্তা আমার জন্য আমার মায়ের দেহ বা শরীর অথবা সত্তার মত। এছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত বাক্যের ব্যাপারে বাক্য প্রয়োগকারীর নিয়ত অনুসারে সিদ্ধান্ত হবে।

হাম্বলী ফিকাহবিদদের মতে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে অথবা তার স্বতন্ত্র কোন অংগকে বিয়ে করা হারাম এমন কোন মহিলার সাথে অথবা তার দেহের স্বতন্ত্র কোন অংগের সাথে স্পষ্ট ভাষায় তুলনা করে তাহলে তা যিহারের স্পষ্ট বাক্য বলে গণ্য করা হবে। মালেকী মাযহাবের অনুসৃত মতও প্রায় অনুরূপ। তবে বিস্তারিত খুটিনাটিতে গিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। যেমন কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে। তুমি আমার জন্য আমার মায়ের তুল্য অথবা আমার মায়ের মত তাহলে মালেকীদের মতে যিহারের নিয়ত থাকলে যিহার হবে, তালাকের নিয়ত থাকলে তালাক হবে এবং কোন নিয়ত না থাকলে যিহার হবে। হাম্বলীদের মতে শুধু নিয়তের শর্তে যিহার বলে গণ্য করা যেতে পারে। কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলে তুমি আমার মা। মালেকীদের মতে তা যিহার হবে। হাম্বলীদের মতে ঝগড়া বিবাদ বা ক্রুদ্ধাবস্থায় বলা হয়ে থাকলে যিহার হবে এবং আদর সোহাগপূর্ণ পরিবেশে বলা হয়ে থাকলে তা খুবই খারাপ কথা। কিন্তু তা যিহার হিসেবে গণ্য হবে না। কেউ যদি স্ত্রীকে বলে ঃ তোমাকে তালাক, তুমি আমার মায়ের মত তাহলে হাম্বলীদের মতে এতে তালাক হবে যিহার নয়। তবে যদি বলে ঃ তুমি আমার মায়ের মত, তোমাকে তালাক তাহলে যিহার ও তালাক উভয়টিই হয়ে যাবে। আর যদি বলে ঃ তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত হারাম তাহলে মালেকী ও হাম্বলী উভয় মাযহাবের ফিকাহবিদদের মতে এ বাক্য তালাকের নিয়তে বলা হোক বা আদৌ কোন নিয়ত না থাক এতে যিহার হবে।

যিহারের বাক্য সম্পর্কিত এ আলোচনায় এ বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে হবে যে, এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণ যত আলোচনা করেছেন তা সবই আরবী ভাষার বাক্য ও বাকরীতি সম্পর্কে। একথা সবারই জানা যে, পৃথিবীর অন্য ভাষাভাষী লোকেরা যিহার করার সময়

আরবী ভাষা ব্যবহার করবে না কিংবা যিহার করার সময় আরবী বাক্য ও বাক্যাংশের হুবহু অনুবাদ উচ্চারণ করবে না। সুতরাং কোন শব্দ বা বাক্যাংশ যিহারের সংজ্ঞায় পড়ে কিনা সে বিষয়ে যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় তাহলে তা ফিকাহবিদদের বর্ণিত বাক্য–সমূহের কোন্‌টির সঠিক অনুবাদ শুধু সেটিই বিচার বিবেচনা করা ঠিক হবে না বরং শুধু এ বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে যে, বক্তা বা শব্দ ব্যবহারকারী ব্যক্তি স্ত্রীকে যৌন (Sexual) সম্পর্কের দিক দিয়ে হারাম নারীদের কারো সাথে সুস্পষ্টভাবে তুলনা করেছে নাকি ঐ সব বাক্যের অন্য কোন অর্থ হওয়ার অবকাশ আছে? আরবী ভাষার أَنْتَ عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّى (তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত) বাক্যটি এর সুস্পষ্ট উদাহরণ। ফিকাহবিদ এবং মুফাসসিরগণ এ বিষয়ে একমত যে, আরবে যিহার করার জন্য এ বাক্যটিই ব্যবহার করা হতো এবং এ বাক্যটি সম্পর্কেই কুরআন মজীদের নির্দেশ নাযিল হয়েছে। সম্ভবত দুনিয়ার কোন ভাষাতেই— উর্দু ভাষা সম্পর্কে তো আমরা অন্তত নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি—যিহারকারী কোন ব্যক্তি এমন বাক্য ব্যবহার করতে পারে না যা এই আরবী বাক্যটির হুবহু শাব্দিক অনুবাদ হতে পারে। তবে তারা নিজের ভাষার এমন সব বাক্য অবশ্যই ব্যবহার করতে পারে যার অর্থ অবিকল তাই যা একজন আরব এইটি দ্বারা প্রকাশ করতো। একথাটি বলার অর্থ ছিল, তোমার সাথে সহবাস করা আমার জন্য আমার মায়ের সাথে সহবাস করার মত। অথবা কোন কোন মূর্খ ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে বসে যে, "আমি যদি তোমার কাছে যাই তাহলে যেন আমার মায়ের কাছেই গেলাম।"

তের ঃ কুরআন মজীদের যে জিনিসকে কাফ্‌ফারা আবশ্যিক হওয়ার কারণ বলা হয়েছে তা শুধু যিহার করা নয়, বরং যিহারের পরবর্তী عود । অর্থাৎ ব্যক্তি যদি শুধু যিহার করে এবং "عود" না করে তাহলে তাকে কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। এখন প্রশ্ন হলো عود কি যা কাফ্‌ফারা দেয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়? এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মতামত নিম্নরূপ ঃ হানাফীদের মতে عود অর্থ সহবাস করার ইচ্ছা। তবে তার অর্থ এই নয় যে, শুধু ইচ্ছা বা আকাংখা করলেই কাফ্‌ফারা দেয়া জরুরী হবে। এমন কি ব্যক্তি যদি শুধু ইচ্ছা করেই থেমে থাকে এবং কার্যত কোন পদক্ষেপ না নেয় তাহলেও তাকে কাফ্‌ফারা দিতে হবে, ব্যাপার এমন নয়। বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি যিহার করার দ্বারা স্ত্রীর সাথে একান্ত দাম্পত্য সম্পর্কের ব্যাপারে যে 'হুরমত' বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল প্রথমে কাফ্‌ফারা তা দূর করে। কারণ এই 'হুরমত' বা নিষেধাজ্ঞা কাফ্‌ফারা দেয়া ছাড়া দূরীভূত হতে পারে না।

এ বিষয়ে ইমাম মালেকের (র) তিনটি মত আছে। তবে এ ব্যাপারে ওপরে হানাফীদের যে মত বর্ণিত হয়েছে সেটিই মালেকীদের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধতম মত। তাঁদের মতে যিহার দ্বারা স্বামী নিজের জন্য যে জিনিসটি হারাম করে নিয়েছিল তা হচ্ছে স্ত্রীর সাথে সহবাসের সম্পর্ক। এরপর عود করা অর্থ পুনরায় তার সাথে সেই সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ফিরে যাওয়া।

এ বিষয়ে ওপরে দুই ইমামের যে মতামত বর্ণনা করা হয়েছে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (র) মতও প্রায় অনুরূপ বলে ইবনে কুদামা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেনঃ যিহার করার পর সহবাস হালাল হওয়ার জন্য কাফ্‌ফারা দেয়া শর্ত। যিহারকারী যে ব্যক্তিই তা হালাল করতে চায় সে যেন হারাম করে নেয়া থেকে ফিরতে চায়। তাই তাকে নির্দেশ

দেয়া হয়েছে যে, হালাল করে নেয়ার পূর্বে সে যেন কাফ্‌ফারা আদায় করে। কোন ব্যক্তি কোন নারীকে নিজের জন্য হালাল করে নিতে চাইলে তাকে হালাল করার পূর্বে যেমন বিয়ে করতে বলা হবে এটা যেন ঠিক তাই।

ইমাম শাফেয়ীর (র) মত এ তিনটি মতামত থেকে ভিন্ন। তিনি বলেন ঃ কারো নিজের স্ত্রীর সাথে যিহার করার পর তাকে পূর্বের মত স্ত্রী হিসেবে রাখা, কিংবা অন্য কথায় তাকে স্ত্রী হিসেবে কাছে রাখাটাই عود । কারণ, সে যে সময় যিহার করেছে সে সময় থেকেই যেন তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখা হারাম করে নিয়েছে। সুতরাং সে যদি যিহার করার সাথে সাথেই তালাক না দিয়ে থাকে এবং তালাকের শব্দগুলো উচ্চারণ করার মত সময়টুকু পর্যন্ত তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখে তাহলে সে عود করলো এবং তার ওপর কাফ্‌ফারা দেয়া ওয়াজিব হয়ে গেল। এর অর্থ হচ্ছে, কেউ এক নিশ্বাসে যিহার করার পর পরবর্তী নিশ্বাসেই যদি তালাক না দেয় তাহলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে পরে তাকে স্ত্রী হিসেবে না রাখার এবং দাম্পত্য সম্পর্ক রক্ষা না করার সিদ্ধান্ত না হলেও কিছু এসে যায় না। এমন কি এর পর সে কয়েক মিনিট চিন্তাভাবনা করে যদি সে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে ইমাম শাফেয়ীর (র) মতানুসারে তবুও তাকে কাফ্‌ফারা দিতে হবে।

চৌদ্দ ঃ কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে, স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে "مس" করার পূর্বেই যিহারকারীকে কাফ্‌ফারা দিতে হবে। এ আয়াতে উল্লেখিত "مس" শব্দের অর্থ স্পর্শ করা এ বিষয়ে চার ইমামই একমত। সুতরাং কাফ্‌ফারা দেয়ার পূর্বে শুধু সহবাসই হারাম নয় বরং স্বামী কোনভাবেই স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারবে না। শাফেয়ী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ বলেনঃ যৌন ইচ্ছা সহ স্পর্শ করা হারাম। হাম্বলী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ সব রকম উপভোগকেই হারাম বলেন। মালেকী ফিকাহবিদগণ স্ত্রীর দেহের প্রতি কামনার দৃষ্টিতে তাকানোও না জায়েজ বলেন। তাঁদের মতে এ অবস্থায় কেবল মুখমণ্ডল ও হাতের দিকে তাকানো যেতে পারে।

পনের ঃ যিহার করার পর স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে 'রিজয়ী' তালাকের ক্ষেত্রে 'রুজু' করার পরও কাফ্‌ফারা দেয়া ছাড়া স্বামী স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারবে না। বায়েন তালাক হওয়ার ক্ষেত্রে সে যদি তাকে পুনরায় বিয়ে করে তখনও স্পর্শ করার পূর্বে কাফ্‌ফারা দিতে হবে। এমনকি যদি তিন তালাকও দিয়ে থাকে এবং স্ত্রী অন্য পুরুষের সাথে বিবাহিতা হওয়ার পর বিধবা অথবা তালাক প্রাপ্তা হয় এবং তারপর যিহারকারী স্বামী তাকে নতুন করে বিয়ে করে, তাহলেও কাফ্‌ফারা ছাড়া সে তার জন্য হালাল হবে না। কেননা, মা বা অন্যান্য চিরনিষিদ্ধ মহিলাদের সাথে স্ত্রীর সাদৃশ্য বর্ণনা করে সে ইতিপূর্বে একবার তাকে নিজের ওপর হারাম বা নিষিদ্ধ করে নিয়েছে। কাফ্‌ফারা ছাড়া সেই হারাম বা নিষিদ্ধাবস্থার অবসান ঘটা সম্ভব নয়। চার ইমামের সকলেই এ ব্যাপারে একমত।

ষোল ঃ যে স্বামী স্ত্রীর সাথে যিহার করেছে কাফ্‌ফারা না দেয়া পর্যন্ত তাকে তার শরীর স্পর্শ করতে না দেয়া স্ত্রীর কর্তব্য। যেহেতু দাম্পত্য সম্পর্ক চালু থাকা স্ত্রীর একটি অধিকার বিশেষ এবং তা থেকে স্বামী তাকে বঞ্চিত করেছে, তাই সে যদি কাফ্‌ফারা না দেয় তবে স্ত্রী আদালতের আশ্রয় নিতে পারে। আদালত তার স্বামীকে সে বাধা অপসারণে

বাধ্য করবে। যা সে নিজের ও তার স্ত্রীর মাঝখানে দাঁড় করিয়েছে। আর যদি সে তা না মানে, তবে আদালত তাকে প্রহার বা কারাদণ্ড বা উভয় প্রকারের দণ্ড দিতে পারে। চার মাযহাবেই এ ব্যাপারে পূর্ণ মতৈক্য রয়েছে। তবে পার্থক্য শুধু এই যে, হানাফী মাযহাবে স্ত্রীর জন্য আদালতের সরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। আদালত যদি স্ত্রীকে এ সংকট থেকে উদ্ধার না করে তবে সে আজীবন ঝুলন্ত অবস্থায়ই থেকে যাবে। কেননা, হানাফী মাযহাব অনুসারে যিহার দ্বারা বিয়ে বাতিল হয় না, কেবল স্বামীর সংগমের অধিকার রহিত হয়। মালেকী মাযহাবে স্বামী যদি স্ত্রীকে নির্যাতন করার জন্য যিহার করে ঝুলিয়ে রাখে। তাহলে সে ক্ষেত্রে "ইলার" বিধান বলবত হবে। অর্থাৎ সে চার মাসের বেশী স্ত্রীকে আটকে রাখতে পারে না। ("ইলা"র বিধান তাফহীমুল কুরআন, সূরা বাকারা ২৪৫ থেকে ২৪৭ টীকায় দ্রষ্টব্য।) আর শাফেয়ী মাযহাবে যদিও স্বামী কেবল নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য যিহার করলেই এবং সে মেয়াদ চার মাসের বেশী হলেই ইলার বিধান কার্যকর হবে। কিন্তু যেহেতু শাফেয়ী মাযহাবে স্বামী স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখলেই কাফ্ফারা দিতে হয়। তাই তার পক্ষে দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্ত্রীকে ঝুলন্ত রাখা সম্ভব হয় না।

সতের ঃ কুরআন ও হাদীসে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে, যিহারের প্রথম কাফ্ফারা হচ্ছে দাস মুক্ত করা। এটা করতে অসমর্থ হলেই দু'মাস ব্যাপী রোযা রাখা এবং তাতেও অসমর্থ হলে ৬০ জন দরিদ্র মানুষকে আহার করানো যেতে পারে। কিন্তু কেউ যদি এ তিন ধরনের কাফ্ফারার কোনটাই দিতে সমর্থ না হয় তাহলে শরীয়াতে কাফ্ফারার অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকা হেতু সে যতক্ষণ পর্যন্ত এ তিন ধরনের কাফ্ফারার কোন একটি দেয়ার সামর্থ লাভ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে। তবে হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, এ ধরনের ব্যক্তি যাতে তৃতীয় কাফফারাটি দিতে পারে সে জন্য তাকে সাহায্য করা উচিত। যারা নিজেদের ভুলের কারণে এরূপ সমস্যার জালে আটকা পড়েছিল, এবং এ তিন প্রকারের কাফ্ফারার কোনটাই দিতে সমর্থ ছিল না, তাদেরকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল মাল থেকে সাহায্য করেছিলেন।

আঠার ঃ পবিত্র কুরআনে কাফ্ফারা হিসেবে যে কোন পরাধীন মানুষকে মুক্ত করার আদেশ দেয়া হয়েছে চাই সে দাস হোক অথবা দাসী হোক। এ ক্ষেত্রে দাস-দাসীর বয়সেরও কোন কড়াকড়ি নেই। দুধ খাওয়া শিশুও যদি গোলামীতে আবদ্ধ হয়ে থাকে তবে তার মুক্তির ব্যবস্থা করাও কাফ্ফারার জন্য যথেষ্ট। তবে মুসলিম ও অমুসলিম উভয় ধরনের দাস-দাসী মুক্ত করা চলবে, না শুধু মুসলিম দাস-দাসী মুক্ত করতে হবে, সে ব্যাপারে মুসলিম ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফী ও যাহেরী মাযহাবের মতানুসারে দাস-দাসী মুসলিম কিংবা অমুসলিম যাই হোক না কেন, তাকে মুক্ত করা যিহারের কাফ্ফারার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা কুরআন শরীফে শর্তহীনভাবে কেবল পরাধীন মানুষকে মুক্ত করতে বলা হয়েছে। তাকে মুসলমানই হতে হবে, একথা বলা হয়নি। পক্ষান্তরে শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব এ দাস-দাসীর মুসলমান হওয়ার শর্ত আরোপ করে। অন্য যেসব কাফ্ফারায় কুরআন শরীফে শুধুমাত্র মুসলিম দাস-দাসীকে মুক্ত করতে বলা হয়েছে। আলোচ্য কাফ্ফারাকেও এ তিন মাযহাবে সেসব কাফ্ফারার সমপর্যায়ের বলে কিয়াস করা হয়েছে।

উনিশ ঃ দাস–দাসী মুক্ত করা সম্ভব না হলে কুরআনের বিধান হলো, স্বামী স্ত্রী কর্তৃক পরস্পরকে স্পর্শ করার আগেই যিহারকারীকে এক নাগাড়ে দু'মাস রোযা রাখতে হবে। আল্লাহর এ আদেশ বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিধিমালা বিভিন্ন মাযহাবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, মাস বলতে এখানে চন্দ্র মাস বুঝানো হয়েছে। চাঁদ ওঠা থেকে যদি রোযা রাখা শুরু করা হয়, তবে দু'টি চন্দ্র মাস পূর্ণ করতে হবে। আর যদি মাসের মধ্যবর্তী কোন তারিখ থেকে শুরু করা হয়, তাহলে হানাফী ও হাম্বলী মাযহাব অনুসারে ষাটদিন রোযা রাখতে হবে। শাফেয়ী মাযহাবের মত এই যে, প্রথম এবং তৃতীয় মাসে সর্বমোট ৩০ দিন রোযা রাখতে হবে। আর মাঝখানের চন্দ্রমাসটি ২৯ দিনের হোক বা ৩০ দিনের হোক—সে মাস রোযা রাখলেই চলবে।

(খ) হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে রোযা এমন সময় শুরু করতে হবে, যাতে মাঝখানে রমযান, ঈদ কিংবা আইয়ামে তাশরীক না পড়ে। কেননা কাফ্ফারার রোযা চলাকালে রমযানের রোযা রাখায় এবং ঈদ ও আইয়ামে তাশরীকে রোযার বিরতি দেয়ায় দু'মাস রোযা রাখার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হবে এবং আবার নতুন করে রোযা রাখতে হবে। হাম্বলী মাযহাবের মত এই যে, রমযানের রোযা রাখা ও নিষিদ্ধ দিনের রোযায় বিরতি দেয়ায় ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয় না

(গ) দু'মাস রোযা রাখার মাঝে যে কোন ওজরের কারণে অথবা বিনা ওজরে রোযা ভাংলেই হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হবে এবং আবার গোড়া থেকে রোযা রাখা শুরু করতে হবে। ইমাম মুহাম্মাদ বাকের, ইবরাহীম নাখয়ী, সাঈদ বিন জুবায়ের এবং সুফিয়ান সাওরীর অভিমতও অনুরূপ। ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতে রোগ বা সফরের কারণে মাঝখানে রোযায় বিরতি দেয়া চলে। এতে ধারাবাহিকতা নষ্ট হবে না। তবে বিনা ওজরে রোযায় বিরতি দিলে ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হয়। শেষোক্ত ইমাম দ্বয়ের যুক্তি এই যে, কাফ্ফারার রোযার গুরুত্ব রমযানের ফরয রোযার গুরুত্বের চেয়ে বেশী নয়। রমযানের রোযা যদি ওজর বশত ছাড়া যায়। তাহলে কাফ্ফারার রোযায় বিরতি দেয়া যাবে না এমন কোন কারণ নেই। অন্য যারা এ অভিমত পোষণ করেন তাঁরা হচ্ছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হাসান বাসরী, আতা বিন আবী রাবাহ, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, আমর বিন দীনার, শা'বী, তাউস, মুজাহিদ, ইসহাক বিন রাহওয়াই, আবু উবাইদ এবং আবু সাওর।

(ঘ) দু'মাস ব্যাপী রোযা চলতে থাকাকালে যিহারকারী যদি তার যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সংগম করে বসে, তা সকল ইমামের সর্বসম্মত মত এই যে, এ দ্বারা ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যাবে এবং নতুন করে রোযা রাখতে হবে। কেননা স্পর্শ করার আগেই দু'মাস রোযা রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে।

বিশ ঃ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তৃতীয় কাফ্ফারাটি (৬০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে আহার করানো) শুধুমাত্র সে ব্যক্তিই দিতে পারে যার দ্বিতীয়টি দেয়ার সামর্থ নেই। (অর্থাৎ দু'মাস ব্যাপী রোযা রাখা) এ বিধিটি বাস্তবায়নের জন্য ফকীহগণ যে বিস্তারিত নিয়মপদ্ধতি রচনা করেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

(ক) চার ইমামের মতে রোযা রাখতে অসমর্থ হওয়ার অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হয় বার্ধক্যের কারণে, নচেত রোগব্যাধির কারণে অথবা এক নাগাড়ে দু'মাস যৌন সংগম থেকে সংযত থাকতে না পারা ও এ সময়ের মধ্যে ধৈর্য হারিয়ে বসার আশংকার কারণে অক্ষম হওয়া। এ তিনটি ওজরই যে সঠিক এবং শরীয়াতে গ্রহণযোগ্য, সে কথা হযরত আওস বিন সাবেত আনসারী এবং সালমা বিন সাখর বায়াজীর বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত। তবে রোগ সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে সামান্য কিছু মতভেদ রয়েছে। হানাফী ফকীহগণের মতে, যে রোগে আরোগ্যলাভের আশা নেই অথবা রোযার কারণে রোগ বেড়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে কেবল সে রোগ ওজর হিসেবে গ্রহণযোগ্য। শাফেয়ী ফকীহগণ বলেন, রোযার কারণে যদি এত কঠিন শারীরিক পরিশ্রম হয় যে, দু'মাসের মাঝখানেই রোযার ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হবার আশংকা থাকে, তাহলে সেটিও একটি সঠিক ওজর বলে বিবেচিত হতে পারে। মালেকী মাযহাবের ফকীহগণের মতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি নিজের সম্পর্কে প্রবলভাবে আস্থাশীল হয় যে, ভবিষ্যতে রোযা রাখতে সক্ষম হবে তাহলে তার অপেক্ষা করা উচিত। আর যদি প্রবলতর ধারণা এটাই হয় যে, আর কখনো রোযা রাখার সামর্থ ফিরে পাবে না, তাহলে দরিদ্র লোকদেরকে আহার করিয়ে দেয়া উচিত। হাম্বলী মাযহাবের মতে রোযার কারণে রোগ বৃদ্ধির আশংকা ওজর হিসেবে যথেষ্ট।

(খ) শুধুমাত্র সেসব দরিদ্র ব্যক্তিকে আহার করানো যাবে, যাদের ভরণ-পোষণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দায়ভুক্ত নয়।

(গ) হানাফী ফকীহগণের মত এই যে, মুসলিম ও অমুসলিম উভয় ধরনের নাগরিককেই আহার করানো চলবে। তবে যুদ্ধরত ও আশ্রয়প্রার্থী অমুসলিমদেরকে আহার করানো যাবে না। মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব অনুসারে শুধুমাত্র মুসলিম দরিদ্রদেরকেই আহার করানো যাবে।

(ঘ) আহার করানো দ্বারা যে দু'বার পেট ভরে খাওয়ানো বুঝায়, সে ব্যপারে কারো দ্বিমত নেই। তবে কিভাবে খাওয়াতে হবে তা নিয়ে মতভেদ আছে। হানাফী মতে দু'বার পেট পুরে খাওয়ার মত খাদ্য শস্য দিয়ে দেয়া অথবা রান্না বান্না করে দু'বেলা খাইয়ে দেয়া দু'টোই শুদ্ধ। কেননা কুরআন শরীফে "ইত্‌য়া'ম" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর অর্থ খাবার দেয়া এবং খাওয়ানো দু'টোই। তবে মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব রান্না করে খাওয়ানো শুদ্ধ মনে করে না বরং খাদ্য শস্য প্রদান করাই সঠিক মনে করে। খাদ্য শস্য দেয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি সর্বসম্মত যে, স্থানীয়ভাবে যেটি জনসাধারণের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত খাদ্য সেটিই দিতে হবে এবং সকল দরিদ্র ব্যক্তিকে সমপরিমাণ দিতে হবে।

(ঙ) হানাফী মতানুসারে একই দরিদ্র ব্যক্তিকে যদি ৬০ দিন ব্যাপী খাবার দেয়া হয় তবে তাও সঠিক হবে। তবে একই দিন তাকে ৬০ দিনের খোরাক দেয়া শুদ্ধ নয়। অন্য তিন মাযহাবে একই দরিদ্র ব্যক্তিকে খাবার দেয়া সঠিক মনে করা হয় না। তাদের মতে ৬০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকেই দিতে হবে। ৬০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে এক বেলার খাবার এবং অন্য ৬০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে আর এক বেলার খাবার দেয়া সকল মাযহাবেই অবৈধ।

(চ) এটাও সকল মাযহাবের মতে অশুদ্ধ যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ৩০ দিনের রোযা রাখবে আর ৩০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে আহার করাবে। দু'রকমের কাফ্ফারার সমাবেশ ঘটানো যাবে না। রোযা রাখতে হলে পুরো দু'মাস এক নাগাড়ে রাখা চাই। খাবার দিতে হলেও ৬০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে দিতে হবে।

(ছ) কাফ্ফারা হিসেবে খাওয়ানোর ক্ষেত্রে যদিও কুরআনে এরূপ শব্দ ব্যবহৃত হয়নি যে, এ কাফ্ফারাও স্বামী স্ত্রীর পরস্পরকে স্পর্শ করার আগেই সমাধা হওয়া চাই, তথাপি বাক্যের অবস্থান ও প্রেক্ষাপট থেকে বুঝা যায় যে, এ কাফ্ফারার ক্ষেত্রেও ঐ শর্তটি বলবত রয়েছে। তাই কাফ্ফারার ভোজনপর্ব চলাকালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যাওয়া চার ইমামের কেউই বৈধ মনে করেন না। তবে এমন কাণ্ড কেউ যদি ঘটিয়েই বসে, তবে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। হাম্বলী মাযহাব মতে আবার খাওয়াতে হবে। কিন্তু হানাফী মাযহাবে তার প্রয়োজন নেই। কেননা, তাদের মতে এই তৃতীয় কাফ্ফারায় সুস্পষ্টভাবে "পরস্পরকে স্পর্শ করার আগে" বলা হয়নি এবং এ কারণে এ ক্ষেত্রে কিছুটা উদারতার অবকাশ রয়েছে।

উল্লিখিত বিধিসমূহ নিম্নোক্ত ফিকাহ শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলী থেকে গৃহীত হয়েছে ঃ

হানাফী ফিকাহ ঃ হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, বাদায়িউস–সানায়ে' এবং আহকামুল কুরআন (জাসসাস)

শাফেয়ী ফিকাহ ঃ আল মিনহাজ (নবাবী) তৎসহ মুগনীল মুহতাজ শীর্ষক টীকা। তাফসীরে কাবীর।

মালেকী ফিকাহ ঃ শারহুল কাবীরের ওপর দাসুকীর টীকা, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, আহকামুল কুরআন (ইবনুল আরাবী)

হাম্বলী ফিকাহ ঃ আল্ মুগ্নী (ইবনে কুদামা)।

জাহেরী ফিকাহ ঃ আল্ মুহাল্লা (ইবনে হাযম)।

১২. এখানে "ঈমান আনা" দ্বারা খাঁটি ও একনিষ্ঠ মু'মিন সুলভ আচরণকে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতের সম্বোধন যে, কাফের ও মুশরিকদের প্রতি নয় বরং আগে থেকেই ঈমান আনা মুসলমানদের প্রতি করা হয়েছে, তা সুস্পষ্ট। তাদেরকে শরীয়াতের একটি নির্দেশ প্রদানের পর একথা বলা যে, "তোমরা যাতে আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান আনো, সে জন্য তোমাদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে" স্পষ্টতই এ তাৎপর্য বহন করে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর এ আদেশ শ্রবণের পরও প্রাচীন জাহেলী রসম রেওয়াজ মেনে চলতে থাকে, তার এ আচরণ ঈমানের পরিপন্থী। এটা কোন মু'মিনের কাজ নয় যে, আল্লাহ ও তার রসূল যখন তার জন্য জীবনের কোন ব্যপারে কোন আইন নির্ধারণ করে দেন, তখন সে তা বাদ দিয়ে দুনিয়ার অন্য কোন আইন মেনে চলবে কিংবা নিজের প্রবৃত্তির ইচ্ছা ও খায়েশ মোতাবেক কাজ করবে।

১৩. এখানে কাফের অর্থ আল্লাহ ও রসূলকে অস্বীকারকারী নয়। এখানে কাফের শব্দটি দ্বারা সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে আল্লাহ ও রসূলকে মান্য করার স্বীকৃতি ও ঘোষণা দেয়ার পরও একজন কাফেরের উপযোগী আচরণ করতে থাকে। অন্য কথায় এ

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ⑤ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑥

যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের বিরোধীতা করে[১৪] তাদেরকে ঠিক সেইভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হবে যেভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হয়েছে।[১৫] আমি পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে সব নির্দেশ নাযিল করেছি। কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।[১৬] (এই অপমানকর শাস্তি হবে) সেই দিন যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে জীবিত করে উঠাবেন এবং তারা কি কাজ করে এসেছে তা জানিয়ে দেবেন। তারা ভুলে গিয়েছে কিন্তু আল্লাহ তাদের সব কৃতকর্ম সযত্নে সংরক্ষণ করেছেন।[১৭] আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বাধিক অবহিত।

উক্তির মর্ম এই যে, আল্লাহ ও তার রসূলের আদেশ শোনার পরও নিজের খেয়াল খুশীমত চলা অথবা জাহেলী রীতি প্রথা ও রসম রেওয়াজের অনুসরণ করতে থাকা আসলে কাফেরদের কাজ। সাচ্চা দিলে ঈমান এনেছে এমন কোন ব্যক্তি এ ধরনের আচরণ করতে পারে না। সূরা আলে ইমরানে যেখানে হজ্জ ফরয করার বিধান ঘোষণা করা হয়েছে সেখানেও ঐ ঘোষণাটির অব্যবহিত পর বলা হয়েছে যে,

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

"আর যে ব্যক্তি কুফরি করবে (অর্থাৎ এ আদেশে অমান্য করবে) তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ জগতবাসীর মোটেই মুখাপেক্ষী নন।"

এ উভয় জায়গায় "কুফর" শব্দটির অর্থ এটা নয় যে, যে ব্যক্তি যিহার করার পর কাফ্‌ফারা না দিয়ে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে, অথবা এরূপ মনে করে যে, যিহার দ্বারাই স্ত্রীর ওপর তালাক কার্যকর হয়ে গেছে অথবা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করে না, শরীয়াতের আদালত তাকে কাফের ও মুরতাদ ঘোষণা করবে এবং সকল মুসলমান তাকে ইসলাম বহির্ভূত মনে করবে। বরঞ্চ এর অর্থ এই যে, আল্লাহর নিকট এ ধরনের লোকেরা মু'মিন বলে গণ্য হয় না, যারা তার আদেশ নিষেধকে কথা বা কাজের মাধ্যমে প্রত্যাখান করে এবং আল্লাহ মানুষের জন্য কি কি সীমা নির্ধারণ করেছেন, কোন্ কোন্ কাজকে ফরয করেছেন, কোন্ কোন্ জিনিসকে হালাল এবং কোন্ কোন্ জিনিসকে হারাম করেছেন তার কোন ধার ধারে না।

১৪. বিরোধীতা করার অর্থ হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা বা বিধিনিষেধ না মেনে তার পরিবর্তে অন্য কতকগুলো মনগড়া সীমারেখা ও বিধিনিষেধ নির্ধারণ করা।

ইবনে জারীর তাবারী এ আয়াতের তাফসীর করেছেন এভাবে ঃ

اى يخالفون فى حدوده وفرائضه فيجعلون حدودا غير حدوده

"তারা আল্লাহর সীমানা ও তার বিধানসমূহের ব্যাপারে তার বিরোধীতা করে এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমার পরিবর্তে অন্যান্য সীমা নির্ধারণ করে।"

আল্লামা বায়যাবী এর তাফসীর প্রসংগে বলেন ঃ

اى يعادونهما و يشاقونهما او يضعون او يختارون حدودا غير حدودهما -

"আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে দুশমনী ও বিবাদে লিপ্ত হয়, অথবা আল্লাহ ও রসূলের নির্ধারিত সীমারেখার পরিবর্তে অন্যান্য সীমারেখা নির্ধারণ করে। অথবা অন্যদের নির্ধারিত সীমারেখাকে মেনে নেয়।"

আল্লামা আলূসী রুহুল মায়ানীতে বায়যাবীর উক্ত তাফসীরের সাথে মতৈক্য প্রকাশ করে শায়খুল ইসলাম সা'দুল্লা চালপীর এই বক্তব্য উদ্বৃত করেছেন যে, "এ আয়াতে সেসব রাজা বাদশাহ ও স্বেচ্ছাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে, যারা শরীয়াতের নির্ধারিত আইনবিধির পরপন্থী বহু আইনবিধি প্রবর্তন করেছে এবং তাকে আইন নামে আখ্যায়িত করেছে।" এ প্রসংগে আল্লামা আলূসী শরীয়াতী আইনের মোকাবিলায় মানব রচিত আইনের সাংবিধানিক অসারতা (অর্থাৎ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সাংবিধানিক অসারতা) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"সে ব্যক্তিতো নিসন্দেহে কাফের, যে মানব রচিত আইনকে উত্তম ও শরীয়াতের চেয়ে ভালো বলে আখ্যায়িত করে এবং বলে যে, এ আইন অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞজনোচিত ও জাতির জন্য অধিকতর উপযোগী। অধিকন্তু তাকে যখন কোন ব্যাপারে বলা হয় যে, শরীয়াতের আদেশ এ ব্যাপারে এরূপ, তখন সে রাগে ফেটে পড়ে। এ ধরনের চরিত্র সম্পন্ন কিছু লোক আমরা দেখেছি, যাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ পড়েছে।"

১৫. মূল আয়াতে ব্যবহৃত শব্দটি হচ্ছে كبت এর অর্থ হচ্ছে লাঞ্ছিত করা, ধ্বংস করা। অভিসম্পাত দেয়া, দরবার থেকে বিতাড়িত করা, ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া, অপমানিত করা। আল্লাহর এ উক্তির মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ ও তার রসূলের বিরোধীতা এবং তার আইন লংঘনের যে পরিণতি পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতেরা ভোগ করেছে, আজকের মুসলমানদের মধ্য থেকে যারা সে আচরণ করবে তারা সে পরিণতি থেকে কোনমতেই রক্ষা পাবে না। তারাও যখন আল্লাহর শরীয়াতের বিরুদ্ধে নিজেদের মনগড়া আইন অনুসরণ করেছে অথবা অন্যদের কাছ থেকে মানব রচিত আইন গ্রহণ করেছে, তখন তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুকম্পা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অধিকন্তু এর ফলে তাদের জীবন এমন সব বিভ্রান্তি, অনাচার এবং নৈতিক ও সামাজিক–সাংস্কৃতিক অপকীর্তি ও

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ
مِنْ نَجْوٰى ثَلٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنٰى
مِنْ ذٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا
عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ۫ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ
بِهِ اللَّهُ ۙ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ
يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٨﴾

২ রুকূ'

আল্লাহ যে আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে অবগত, সে ব্যাপারে তুমি কি সচেতন নও?[১৮] যখনই তিন ব্যক্তির মধ্যে কোন গোপন কানাঘুষা হয়, তখন সেখানে আল্লাহ অবশ্যই চতুর্থজন হিসেবে উপস্থিত থাকেন। যখনই পাঁচজনের মধ্যে গোপন সলাপরামর্শ হয় তখন সেখানে ষষ্ঠ জন হিসেবে আল্লাহ অবশ্যই বিদ্যমান থাকেন।[১৯] গোপন সলাপরামর্শকারীরা সংখ্যায় এর চেয়ে কম হোক বা বেশী হোক, এবং তারা যেখানেই থাকুক, আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন।[২০] তারপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন তারা কে কি করেছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তথাপি তারা সে নিষিদ্ধ কাজ করে চলেছে?[২১] তারা লুকিয়ে লুকিয়ে পরস্পরে গোনাহ, বাড়াবাড়ি এবং রসূলের অবাধ্যতার কথাবার্তা বলাবলি করে, আর যখন তোমার কাছে আসে, তখন তোমাকে এমনভাবে সালাম করে যেভাবে আল্লাহ তোমাকে ছালাম করে নি।[২২] আর মনে মনে বলে যে, আমাদের এসব কথাবার্তার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেয় না কেন?[২৩] তাদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। তারা তাতেই দগ্ধ হবে। তাদের পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয়।

পাপাচারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে যে, দুনিয়ার জীবনেই তারা চরম লাঞ্ছনা গঞ্জনার শিকার হয়েছে। উম্মাতে মুহাম্মাদী যদি আজ এই একই ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়, তাহলেও তারা আল্লাহর প্রিয়ই থাকবে এবং আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছনা গঞ্জনার গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতেই থাকবেন— এর কোনই কারণ নেই। পূর্তবর্তী রসূলগণের উম্মাতদের সাথেও আল্লাহর কোন শত্রুতা ছিল না, আর শেষ নবীর উম্মতের সাথেও আল্লাহর কোন বিশেষ আত্মীয়তা নেই।

১৬. বাক্যের প্রেক্ষিত নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে বুঝা যায় যে, এখানে এ আচরণের দু'টো শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে অবমাননা ও লাঞ্ছনা—যার শিকার এ দুনিয়াতেই হতে হয়েছে এবং হতে হবে। অপরটি হচ্ছে অপমানজনক আযাব-যা আখেরাতে ভোগ করতে হবে।

১৭. অর্থাৎ তারা ভুলে গেছে বলেই ব্যাপারটা মিটে যায়নি। আল্লাহর অবাধ্যতা ও তাঁর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ তাদের কাছে এমন মামুলী বিষয় বিবেচিত হতে পারে যা করে তারা মনেও রাখেনা, এমনকি তাকে আদৌ কোন আপত্তিকর জিনিসই মনে করে না যে, তারা তার কিছুমাত্র পরোয়া করবে। কিন্তু আল্লাহর কাছে তা মোটেই মামুলী জিনিস নয়। তার কাছে তাদের প্রতিটি তৎপরতা নিবন্ধিত হয়ে গেছে। কোন্ ব্যক্তি কখন, কোথায়, কি কাজ করেছে তা করার পর তার নিজের প্রতিক্রিয়া কি ছিল, আর অন্যত্র কোথায় কোথায় তার কি কি ফলাফল কি কি আকারে দেখা দিয়েছে, এ সবই সবিস্তারে তার রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

১৮. এখান থেকে ১০ নং আয়াত পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে মুসলিম সমাজে মুনাফিকরা যে কর্মধারা চালিয়ে যাচ্ছিল তার সমালোচনা করা হয়েছে। বাহ্যত তারা মুসলমানদের সমাজে বসবাস করলেও ভেতরে ভেতরে তারা মু'মিনদের থেকে স্বতন্ত্র নিজেদের একটা জোট বানিয়ে রেখেছিল। মুসলমানরা যখনই তাদেরকে দেখতো, এটাই দেখতো যে, তারা পরস্পরে কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে। এসব গোপন সলাপরামর্শের মধ্য দিয়ে তারা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি এবং রকমারি ফিতনা-বিভ্রান্তি ও ভয়ভীতি ছড়ানোর জন্য নানা ধরনের চক্রান্ত আঁটতো এবং গুজব রটাতো।

১৯. এখানে প্রশ্ন জাগে যে, এ আয়াতে দুই ও তিনের বদলে তিন ও পাঁচের উল্লেখের রহস্য কি? প্রথমে দুই এবং তার পরে চার বাদ দেয়া হলো কেন? তাফসীরকারগণ এর অনেকগুলো জবাব দিয়েছেন। তবে আমার মতে সঠিক জবাব এই যে, আসলে পবিত্র কুরআনের সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও ভাষাগত মাধুর্য বজায় রাখার জন্যই এই বর্ণনাভংগী অবলম্বন করা হয়েছে। এটা না করা হলে বর্ণনা ভংগীটা এ রকম দাঁড়াতো ঃ

مَا يَكُوْنُ مِنْ نَجْوٰى اثْنَيْنِ اِلاَّ هُوَ ثَالِثُهُمْ وَلاَ ثَلٰثَةٍ اِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ

এতে نَجْوٰى اثْنَيْنِ কথাটার শব্দ বিন্যাস যেমন সুন্দর হতো না, তেমনি ثَالِثُ ও ثَلٰثَةٍ শব্দ দু'টির পর পর আসাও শ্রুতিমধুর হতো না اِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ এরপর وَلاَ اَرْبَعَةٍ বলাটাও একই রকমের শ্রুতিকটু লাগতো। এজন্য প্রথমে তিন ও পাঁচজন ফিসফিসকারীর উল্লেখ করার পর পরবর্তী বাক্যে এই বলে শূন্যতা পুরণ করা হয়েছে যে,

وَلاَ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ اَكْثَرَ اِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝ اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যখন পরস্পরে গোপন অলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হও তখন পাপ, জুলুম ও রসূলের অবাধ্যতার কথা বলাবলি করো না, বরং সততা ও আল্লাহভীতির কথাবার্তা বল এবং যে আল্লাহর কাছে হাশরের দিন তোমাদের উপস্থিত হতে হবে, তাঁকে ভয় কর।[২৪] কানাঘুষা একটা শয়তানী কাজ এবং ঈমানদার লোকদের মনে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যেই তা করা হয়। অবশ্য আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। আর মু'মিনদের কর্তব্য হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করা।[২৫]

"ফিসফিসকারীরা চাই তিনের চেয়ে কম বা পাঁচের চেয়ে বেশী হোক, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাদের সংগে থাকেন।"

২০. বান্দার সংগে আল্লাহর এই অবস্থান বা সাহচর্য মূলত আল্লাহর সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়াকেই বুঝায়। এরূপ নয় যে, (নাউজুবিল্লাহ) তিনি কোন ভৌতিক বা জৈবিক ব্যক্তি এবং পাঁচ ব্যক্তির বৈঠকে ষষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে কোথাও আত্মগোপন করে অবস্থান করেন। আসলে একথা দ্বারা মানুষকে এ মর্মে সচেতন করাই আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য যে, সে যতই সুরক্ষিত স্থানে বসে গোপন সলাপরামর্শ করুক না কেন, তাদের কথাবার্তা দুনিয়ার আর কারো কর্ণগোচর না হোক আল্লাহর গোচরীভূত না হয়ে পারে না। পৃথিবীর আর কোন শক্তি তাদেরকে পাকড়াও করতে না পারুক আল্লাহর পাকড়াও থেকে তারা কিছুতেই বাঁচতে পারবে না।

২১. এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, এ আয়াত নাযিল হবার আগে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও যখন তারা এ থেকে নিবৃত্ত হয়নি, তখন সরাসরি আল্লাহর কাছথেকে এ ভর্ৎসনাপূর্ণ বাণী নাযিল হয়।

২২. ইহুদী ও মুনাফিক-উভয় গোষ্ঠী এ ধরনের আচরণে লিপ্ত ছিল। একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক ইহুদী রসূল (সা) এর দরবারে উপনীত হয়ে বললো ঃ السام عليك يا ابا القاسم অর্থাৎ "আসসামু আলাইকা ইয়া আবাল কাসেম" কথাটা এমনভাবে উচ্চারণ করলো যে, শ্রোতা মনে করতে পারে যে, তারা তাকে সালাম দিয়েছে। অথচ আসলে তারা বলেছে আস্‌সামু আলাইকা অর্থাৎ তোমার মৃত্যু হোক। রসূল (সা) জবাবে বললেন ঃ وعليكم অর্থাৎ "তোমাদের ওপরও"। হযরত আয়েশা (রা)

আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। তিনি বললেন, "তোমাদের মৃত্যু হোক এবং আল্লাহর গযব ও অভিশাপ পড়ুক।" রসূল (সা) বললেন ঃ হে আয়েশা, আল্লাহ তা'আলা কটু বাক্য পসন্দ করেন না। হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ হে রসূল, ওরা কি বলেছে তা কি আপনি শোনেননি? রসূল (সা) বললেন ঃ আর আমি কি জবাব দিয়েছি তা তুমি শোনোনি? আমি তাদেরকে বলে দিয়েছি "তোমাদের ওপরও।" (বুখারী, মুসলিম, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন যে, মুনাফিক ও ইহুদী উভয় গোষ্ঠী এভাবেই সালাম দিতো। (ইবনে জারীর)

২৩. অর্থাৎ তারা এ জিনিসটাকে রসূল (সা) এর রসূল হওয়ার প্রমাণ মনে করতো। তারা ভাবতো যে, তিনি যদি রসূল হতেন, তাহলে যে মুহূর্তে আমরা "আসসালামু আলাইকা"র পরিবর্তে "আস্সামু আলাইকা" বলেছি, সে মুহূর্তে আমাদের ওপর আযাব এসে যেতো, আমরা দিনরাত এরূপ আচরণ করা সত্ত্বেও যখন কোন আযাব আসেনি, তখন ইনি রসূল নন।

২৪. এ বক্তব্য থেকে বুঝা গেল যে, পরস্পরে গোপন আলাপ–আলোচনা করা মূলত কোন নিষিদ্ধ কাজ নয়। যারা এ ধরনের আলাপ আলোচনা করে তারা কেমন চরিত্রের লোক, যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এরূপ আলোচনা করা হয় তা কি ধরনের পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং যে কথাবার্তা এভাবে গোপনে অনুষ্ঠিত হয় তা কি ধরনের কথাবার্তা, তার ওপরই এর বৈধতা বা অবৈধতা নির্ভরশীল। সমাজে যাদের সততা, ন্যায়নিষ্ঠতা ও নির্মল চরিত্রের সর্বব্যাপী–খ্যাতি ও পরিচিতি বিরাজমান, তারা কোথাও গোপন পরামর্শে লিপ্ত দেখলে কারো মনে এরূপ সন্দেহ জন্মে না যে, তারা কোন দুরভিসন্ধিতে বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে সমাজে যারা অনাচার ও অপকর্মের হোতা এবং দুশ্চরিত্র রূপে খ্যাত, তাদের গোপন সলাপরামর্শ যে কোন মানুষের মনে এরূপ খট্কা ও শংকার জন্ম দেয় যে, একটা কিছু গোলযোগ পাকানোর প্রস্তুতি নিশ্চয়ই চলছে। ঘটনাচক্রে কখনো দু'চার ব্যক্তি কোন ব্যাপারে চুপিসারে কিছু আলোচনা সেরে নিলে সেটা কোন আপত্তিকর ব্যাপার হয় না। কিন্তু কিছু লোক যদি নিজেদের একটা আলাদা স্থায়ী দল বানিয়ে নেয় এবং সাধারণ মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হরহামেশা গোপন সলাপরামর্শ চালাতে থাকে, তাহলে সেটা অবশ্যই একটা দুর্যোগের পূর্বলক্ষণ। আর না হোক, এ দ্বারা অন্তত এতটুকু ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী যে, এতে মুসলমানদের মধ্যে দলাদলির ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে। সর্বোপরি, যে জিনিসের ওপর এসব গোপন সলাপরামর্শের বৈধ বা অবৈধ হওয়া নির্ভর করে। তা হচ্ছে এ গোপন সলাপরামর্শের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু। দুই ব্যক্তি যদি কোন ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে, কারো কোন ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করিয়ে দেয়ার মানসে, অথবা কোন ভালো কাজে অংশ গ্রহণের লক্ষে গোপন আলাপ আলোচনা করে, তবে তা কোন অন্যায় কাজ নয়, বরং তা সওয়াবের কাজ। পক্ষান্তরে একাধিক ব্যক্তির সলাপরামর্শের উদ্দেশ্য যদি হয় কোন গোলযোগ ও নাশকতা সংঘটিত করার চক্রান্ত করা, কারো অধিকার নষ্ট করা কিংবা কোন পাপকাজ সংঘটিত করার ফন্দি আঁটা—তাহলে এরূপ অসদুদ্দেশ্য পোষণ করাটাই যে এক দুষ্কৃতি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এই অসদুদ্দেশ্য নিয়ে গোপন সলাপরামর্শ করা দ্বিগুণ পাপ ও দুষ্কৃতি।

এ ব্যাপারে যে মজলিসী রীতিনীতি রসূল (সা) শিক্ষা দিয়েছেন তা এই যে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَ اِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۱﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾

হে ঈমানদারগণ! মজলিসে জায়গা করে দিতে বলা হলে জায়গা করে দিও, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রশস্ততা দান করবেন।[২৬] আর যখন চলে যেতে বলা হবে, তখন চলে যেও।[২৭] তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদের মর্যাদা আল্লাহ উন্নীত করবেন।[২৮] বস্তুত আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন রসূলের সাথে গোপন আলাপ কর তখন আলাপ করার আগে কিছু সদকা দিয়ে নাও।[২৯] এটা তোমাদের জন্য অপেক্ষাকৃত ভালো ও পবিত্র। তবে যদি সদকা দিতে কিছু না পাও তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فان ذالك يحزنه

"যখন তিন ব্যক্তি এক জায়গায় বসা থাকবে, তখন তাদের মধ্য থেকে দু'জনের তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে গোপন সলাপরামর্শ করা উচিত নয়। কেননা, এটা তৃতীয় ব্যক্তির মনোকষ্টের কারণ হবে। "(বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

অপর হাদীসে রসূল (সা) বলেন ঃ

فلا يتناجى اثنان دون الثالث الا باذنه فان ذلك يحزنه

"তৃতীয় ব্যক্তির অনুমতি না নিয়ে তাকে বাদ দিয়ে দু'জনে গোপন আলোচনা করা চাই না। কারণ সেটা তার জন্য মনোপীড়াদায়ক হবে।" (মুসলিম)

দুই ব্যক্তি যদি তৃতীয় ব্যক্তির উপাস্থিতিতেই সে বুঝতে পারে না এমন ভাষায় কথা বলে, তবে সেটাও এ অবৈধ গোপন সংলাপের আওতায় আসে। এরচেয়েও জঘন্য অবৈধ কাজ–হলো গোপন সংলাপের সময় কারো দিকে এমনভাবে তাকানো বা ইশারা করা, যাতে বুঝা যায় যে, তাকে নিয়েই তাদের কথাবার্তা চলছে।

২৫. একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, কতিপয় ব্যক্তির গোপন সলাপরামর্শ দেখে কোন মুসলমানের মনে যদি এরূপ সন্দেহ জন্মেও যায় যে, এসব সলাপরামর্শ তার বিরুদ্ধেই

চলছে, তা হলেও তার এতটা দুঃখ পাওয়া ও ঘাবড়ে যাওয়া উচিত নয় যে, নিছক সন্দেহের বশেই কোন পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তা তাকে পেয়ে বসে, অথবা তার মনে কোন দুশ্চিন্তা, বিদ্বেষ অথবা অস্বাভাবিক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সঞ্চার হতে থাকে। তার বুঝা উচিত যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। এ আস্থা ও প্রত্যয় তার মনে এমন দুর্জয় শক্তির জন্ম দেবে যে, অনেক ভিত্তিহীন শংকা এবং কাল্পনিক ভয়ভীতি ও উৎকণ্ঠা থেকে সে মুক্তি পেয়ে যাবে। দুষ্কৃতিকারীদের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন ও নিশ্চিন্ত মনে আপন কাজে নিয়োজিত থাকবে। আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল মু'মিন ব্যক্তি এমন অস্থিরচিত্ত হয় না যে, যে কোন ভীতি ও আশংকা তার মনকে বিচলিত ও অশান্ত করে তুলবে। সে এতটা হীনমনাও হয় না যে, দুষ্কৃতিকারীদের উস্কানিতে উত্তেজিত ও ধৈর্যহারা হয়ে নিজেও ইনসাফ বিরোধী কার্যকলাপ করতে আরম্ভ করবে।

২৬. সূরার ভূমিকায় এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কতক মুফাস্‌সির এ আদেশকে শুধুমাত্র রসূল (সা) এর মজলিসের মধ্যে সীমিত মনে করেছেন। তবে ইমাম মালেক প্রমূখের এ মতটিই সঠিক যে, মুসলমানদের সকল বৈঠকাদির জন্য এটি একটি স্থায়ী বিধি। আল্লাহ ও তার রসূল মুসলিম জাতিকে যে সামাজিক রীতিনীতি, আদব আখলাক ও আচার ব্যবহার শিখিয়েছেন। এটি তার অন্যতম। আগে থেকে কিছু লোক বসে আছে এমন একটি মজলিসে যখন আরো কিছু লোক যোগ দেবে, তখন আগের সমবেত লোকদের মধ্যে এ সৌজন্য বোধ থাকা বাঞ্ছনীয় যে, স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে নবাগতদের জন্য জায়গা করে দেবে এবং নিজেরা যথাসম্ভব চেপে বসে তাদের বসার সুযোগ করে দেবে। আবার নবাগতদের মধ্যেও এতটা ভদ্রতা থাকা উচিত যে, তারা যেন জোর জবরদস্তির সাথে ভেতরে না ঢোকে এবং একজনকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসার চেষ্টা না করে। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে ওমর ও হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হাদীসে রসূল (সা) বলেছেন ঃ

لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا –

"কেউ যেন কাউকে উঠিয়ে তার জায়গায় না বসে। তোমরা বরং স্বেচ্ছায় অন্যদের জন্য জায়গা করে দাও।" (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ

لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما

"দু'জনের মাঝখানে তাদের অনুমতি ছাড়া জোর পূর্বক চেপে বসা বৈধ নয়।"
(মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

২৭. আবদুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম জানান যে, লোকেরা রসূল (সা) এর মজলিসে দীর্ঘ সময় বসে থাকতো এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বসে থাকার চেষ্টা করতো। এতে অনেক সময় রসূল (সা) এর কষ্ট হতো। তাঁর বিশ্রামের যেমন বিঘ্ন ঘটতো, তেমনি কাজকর্মেও অসুবিধার সৃষ্টি হতো। এজন্য এ আদেশ নাযিল হয় যে, যখন চলে যেতে বলা হয় তখন চলে যাও। (ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর)

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ۚ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٣﴾

গোপন আলাপ–আলোচনা করার আগে সদকা দিতে হবে ভেবে তোমরা ঘাবড়ে গেলে না কি? ঠিক আছে, সেটা যদি না করতে চাও,—বস্তুত আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে অব্যাহতি দিয়ে দিয়েছেন।—তাহলে নামায কায়েম করতে ও যাকাত দিতে থাকো এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ নিষেধ মেনে চলতে থাকো। মনে রেখো তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ ওয়াকিফহাল।[৩০]

২৮. অর্থাৎ এরূপ ভেবো না যে, রসূল (সা) এর মজলিসে অন্যদেরকে জায়গা করে দিতে গিয়ে যদি তোমাদের তার কাছ থেকে একটু দূরে গিয়ে বসতে হয় তাহলে তোমাদের সম্মান হানি ঘটবে, কিংবা তোমাদেরকে চলে যেতে বলা হলে তোমাদের অবমাননা হবে। মর্যাদা বৃদ্ধির আসল উৎস হলো ঈমান ও ইসলামী জ্ঞান। রসূল (সা) এর মজলিসে কে তার কতটা নিকটে বসলো, এবং কে কত বেশী সময় বসে কাটালো, তা দ্বারা কারো সম্মান নিরূপিত হয় না। কেউ যদি রসূল (সা) এর খুব কাছাকাছি বসতে পারে। তাহলেই যে তার মর্যাদা বেড়ে যাবে তা নয়। মর্যাদা বাড়বে তারই যার ঈমান ও ইসলামী জ্ঞান বেশী হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি বেশী সময় বসে থেকে আল্লাহর রসূলকে বিব্রত করে তাহলে সে বরঞ্চ মূর্খতার কাজই করে। শুধুমাত্র রসূলের (সা) কাছে বেশী সময় বসে থাকার করণে কারো মর্যাদা বেশী হবে না। আল্লাহর কাছে অধিকতর মর্যাদা হবে সে ব্যক্তির যে রসূল (সা) এর সাহচর্য দ্বারা ঈমান ও ইসলামী জ্ঞানের মত অমূল্য সম্পদ আহরণ করেছে এবং মু'মিন সুলভ স্বভাব ও চরিত্র অর্জন করেছে।

২৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুসারে এ আদেশের কারণ এই যে, মুসলমানরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে (নিভৃতে কথা বলার আবেদন জানিয়ে) এত বেশী জিজ্ঞাসাবাদ করতো যে, তিনি বিরক্ত হয়ে ওঠেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁর ওপর থেকে এ বোঝা হালকা করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। (ইবনে জারীর) যায়েদ বিন আসলাম বলেন যে, যে কেউ রসূল (সা) এর সাথে নিভৃতে কথা বলতে চাইতো, তিনি তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করতেন না। যার ইচ্ছা হতো, এসে বলতো, আমি একটু নিভৃতে কথা বলতে চাই। আর রসূল (সা) তাতে সম্মতি দিতেন। এতে পরিস্থিতি এত দূর গড়ালো যে, নিভৃতে বলার আদৌ প্রয়োজন হয় না এমন ব্যাপারেও অনেকে রসূল (সা)–কে কষ্ট দিতে লাগলো। এ সময়টা ছিল এমন যে, সমগ্র আরব মদীনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। কখনো কখনো এমনও হতো যে, কোন ব্যক্তি এভাবে রসূল (সা)–এর সাথে গোপনে কথা বলার পর শয়তান মানুষের কানে কানে রটিয়ে দিত যে, এ লোকটি অমুক গোত্র কবে মদীনায় আক্রমণ চালাবে সে খবর দিয়ে গেল। এভাবে মদীনায় গুজবের

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ مَا هُمْ مِنْكُمْ
وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا
شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً
فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٦﴾ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ
وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿١٧﴾

৩ রুকু'

তুমি কি তাদের দেখনি যারা এমন এক গোষ্ঠীকে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে যারা আল্লাহর গযবে নিপতিত।[৩১] *তারা তোমাদেরও নয়, তাদেরও নয়।*[৩২] *তারা জেনে ও বুঝে মিথ্যা বিষয়ে কসম করে।*[৩৩] *আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। তারা যা করছে তা অত্যন্ত মন্দ কাজ। তারা নিজেদের কসমকে ঢাল বানিয়ে রেখেছে। এর আড়ালে থেকে তারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেয়।*[৩৪] *এ কারণে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব। আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের অর্থ-সম্পদ যেমন কাজে আসবে না, তেমনি সন্তান-সন্ততিও কোন কাজে আসবে না। তারা দোযখের উপযুক্ত, সেখানেই তারা চিরদিন থাকবে।*

ছড়াছড়ি হতো। অপর দিকে মুসলমানদের এরূপ আচরণের দরুন মুনাফিকরা একথা বলার সুযোগ পেয়ে যেতো যে, মুহাম্মাদ (সা) যে যা বলে তাই শোনেন, সত্য মিথ্যার বাছবিচার করেন না। এসব কারণে আল্লাহ এ বিধিনিষেধ আরোপ করলেন যে, যে ব্যক্তি রসূল (সা) এর সাথে গোপনে কথা বলতে চাইবে, তার আগে সাদকা দিতে হবে। (আহকামুল কুরআন ইবনুল আরাবী) কাতাদাহ বলেন যে, অন্যদের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার উদ্দেশ্যে কেউ কেউ রসূল (সা) এর সাথে নিভৃতে কথা বলতো।

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ এ আদেশ নাযিল হবার পর রসূল (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, সাদকা কত ধার্য করা উচিত? এক দীনার? আমি বললাম, এটা মানুষের সাধ্যের বাইরে হবে। তিনি বললেন ঃ আধা দীনার? আমি বললাম, এটাও তাদের ক্ষমতার আওতাবহির্ভূত। তিনি বললেন, তাহলে কত? আমি বললাম, একটি জবের দানা পরিমাণ স্বর্ণ। তিনি বললেন, انك لزهيد অর্থাৎ তুমি খুবই কম পরিমাণের পরামর্শ দিলে। (ইবনে

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ
أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٨﴾ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ
فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ
الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾
كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾

যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে জীবিত করে উঠাবেন সেদিন তাঁর সামনেও তারা ঠিক সেভাবে কসম করবে যেমন তোমাদের সামনে কসম করে থাকে[৩৫] এবং মনে করবে এভাবে তাদের কিছু কাজ অন্তত হবে। ভাল করে জেনে রাখো, তারা যারপর নাই মিথ্যাবাদী। শয়তান তাদের ওপর চেপে বসেছে এবং তাদের অন্তর থেকে আল্লাহর স্মরণ মুছে দিয়েছে। তারা শয়তানের দলভুক্ত লোক। সাবধান! শয়তানের দলভুক্ত লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের মোকাবিলা করে নিসন্দেহে তারা নিকৃষ্টতর সৃষ্টি। আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যে, তিনি এবং তাঁর রসূল অবশ্যই বিজয়ী হবেন।[৩৬] প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মহা শক্তিমান ও পরাক্রমশালী।

জারীর, তিরমিযী, মুসনাদে আবু ইয়া'লা) অপর এক বর্ণনা মতে হযরত আলী (রা) বলেন ঃ এটি কুরআনের এমন এক আয়াত যা আমি ছাড়া আর কেউ বাস্তবায়িত করেনি। এ আদেশ আশা মাত্রই আমি একটি সাদকা দিয়ে রসূল (সা) এর কাছ থেকে একটি মাসয়ালা গোপনে জেনে নেই। (ইবনে জারীর, হাকেম, ইবনুল মুনযির, আবদ বিন হুমাইদ)

৩০. উপরোক্ত নির্দেশের অল্প দিন পরে এ দ্বিতীয় নির্দেশটি নাযিল হয়। এর দ্বারা সাদকার বাধ্যবাধকতা রহিত হয়। সাদকার বাধ্যবাধকতা কতদিন ছিল, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কাতাদাহ বলেন, একদিনের চেয়েও কম সময় চালু ছিল, তারপর রহিত হয়ে যায়। মুকাতেল বিন হাইয়ান বলেন, দশদিন ছিল। এটাই এ আদেশ বহাল থাকার সর্বোচ্চ বর্ণিত মেয়াদ।

৩১. এখানে মদীনার ইহুদীদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, মুনাফিকরা এসব ইহুদীদেরকেই বন্ধু বানিয়ে রেখেছিল।

৩২. অর্থাৎ মুসলমান বা ইহুদী কারো সাথেই তাদের আন্তরিক সম্পর্ক ছিল না। নিজেদের স্বার্থের কারণেই তারা উভয়ের সাথে সম্পর্ক পাতিয়ে রেখেছিল।

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۲۲﴾

তোমরা কখনো এমন দেখতে পাবে না যে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে তারা এমন লোকদের ভাল বাসছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধীতা করেছে। তারা তাদের পিতা, অথবা পুত্র অথবা ভাই অথবা গোষ্ঠীভুক্ত৩৭ হলেও তাতে কিছু এসে যায় না। আল্লাহ এসব লোকদের হৃদয়–মনে ঈমান বদ্ধমুল করে দিয়েছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে একটি 'রূহ' দান করে তাদের শক্তি যুগিয়েছেন। তিনি তাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। তারা আল্লাহর দলের লোক। জেনে রেখো আল্লাহর দলের লোকেরাই সফলকাম।

৩৩. অর্থাৎ তারা এই বলে মিথ্যামিথ্যি কসম খায় যে, তারা ঈমান এনেছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের নেতা ও পথ প্রদর্শনকারী হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের প্রতি বিশ্বস্ত আছে।

৩৪. এর অর্থ একদিকে তারা নিজেদের ঈমান ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কসম খেয়ে মুসলমানদের আক্রোশ থেকে নিজেদের রক্ষা করে, অপরদিকে মানুষের মধ্যে ইসলাম, ইসলামের অনুসারী এবং ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে নানা রকম সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে যাতে মানুষ এ কথা চিন্তা করে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থাকে যে, ইসলামের ঘরের লোকেরাই যখন একথা বলছে তখন এর মধ্যে ব্যাপার কিছু একটা অবশ্যই আছে।

৩৫. অর্থাৎ তারা শুধু দুনিয়াতেই এবং শুধু মানুষের সামনেই মিথ্যা মিথ্যা শপথ করে না। আখরাতে আল্লাহ তা'আলার সামনেও তারা মিথ্যা শপথ করা থেকে বিরত হবে না। মিথ্যা এবং প্রতারণা তাদের মনের এত গভীরে স্থান করে নিয়েছে যে, মৃত্যুর পরও এরা তা থেকে মুক্ত হতে পারবে না।

৩৬. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আস্ সাফফাত, টীকা–৯৩।

৩৭. এ আয়াতে দুইটি কথা বলা হয়েছে। একটি নীতি কথা। অন্যটি প্রকৃত ঘটনার বর্ণনা। নীতি কথায় বলা হয়েছে যে, সত্য দীনের প্রতি ঈমান এবং দীনের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা দু'টি সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী জিনিস। এ দু'টি জিনিসের একত্র সমাবেশ বা অবস্থান কোনভাবে কল্পনাও করা যায় না। ঈমান এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শত্রুদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব একই হৃদয়ে একত্রিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। কোন মানুষের হৃদয়ে যখন একই সাথে নিজের প্রতি ভালবাসা এবং শত্রুর প্রতি ভালবাসা একত্রিত হতে পারে না তখন এটাও ঠিক অনুরূপ ব্যাপার। অতএব তোমরা যদি কাউকে দেখো, সে ঈমানের দাবীও করে এবং সাথে সাথে ইসলাম বিরোধী লোকদের সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্কও রাখে তাহলে তোমাদের মনে কখনো যেন এ ভুল ধারণা না জন্মে যে, এ আচরণ সত্ত্বেও সে তার ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী। অনুরূপ যেসব লোক একই সাথে ইসলাম ও ইসলাম বিরোধীদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলছে সে নিজেও যেন তার এ অবস্থান ভালভাবে চিন্তা ভাবনা করে দেখে যে, প্রকৃতপক্ষে সে কি, মু'মিন না মুনাফিক? সে প্রকৃতপক্ষে কি হতে চায়, মু'মিন হয়ে থাকতে চায়, না মুনাফিক হয়ে? তার মধ্যে যদি সততার লেশমাত্রও থেকে থাকে এবং মুনাফিকীর আচরণ যে নৈতিক দিক দিয়ে মানুষের জন্য নিকৃষ্টতম আচরণ এ বিষয়ে তার মধ্যে সামান্যতম অনুভূতিও থাকে তা হলে তার উচিত একই সাথে দুই নৌকায় আরোহণের চেষ্টা পরিত্যাগ করা। ঈমান এ ব্যাপারে তার কাছে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত দাবী করে। সে যদি মু'মিন থাকতে চায় তা হলে যেসব সম্পর্ক ও বন্ধন ইসলামের সংগে তার সম্পর্ক ও বন্ধনের সাথে সাংঘর্ষিক তার সবই তাকে বর্জন করতে হবে। ইসলামের সাথে সম্পর্কের চাইতে অন্য কোন সম্পর্ক প্রিয়তর হয়ে থাকলে ঈমানের মিথ্যা দাবী ছেড়ে দেয়াই উত্তম।

এটি ছিল নীতিগত কথা। কিন্তু এখানে আল্লাহ তা'আলা শুধু নীতি বর্ণনা করাই যথেষ্ট মনে করেননি। বরং ঈমানের দাবীদারদের সামনে নমুনা স্বরূপ এ বাস্তব ঘটনাও পেশ করেছেন যে, সত্যিকার ঈমানদারগণ বাস্তবে সবার চোখের সামনে সে সম্পর্ক ও বন্ধন ছিন্ন করেছিল যা আল্লাহর দীনের সাথে তাদের সম্পর্কের পথে প্রতিবন্ধক ছিল। এটা ছিল এমন একটা ঘটনা যা বদর ও উহুদ যুদ্ধের সময় সমগ্র আরব জাতি প্রত্যক্ষ করেছিল। যেসব সাহাবায়ে কিরাম মক্কা থেকে হিজরত করে এসেছিলেন তারা শুধু আল্লাহ এবং তাঁর দীনের খাতিরে নিজেদের গোত্র এবং ঘনিষ্ঠতর নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। হযরত আবু উবাইদাহ তাঁর নিজের পিতা আবদুল্লাহ ইবনে জাররাহকে হত্যা করেছিলেন। হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের আপন ভাই উবাইদ ইবনে উমায়েরকে হত্যা করেছিলেন। হযরত উমর (রা) তাঁর মামা আস ইবনে হিশাম ইবনে মুগীরাহকে হত্যা করেন। হযরত আবু বকর (রা) তাঁর পুত্র আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত হয়েছিলেন। হযরত আলী, হযরত হামযা এবং হযরত উবাইদা ইবনুল হারেস তাঁদের নিকটাত্মীয় উতবা, শায়বা এবং ওয়ালীদ ইবনে উতবাকে হত্যা করেছিলেন। বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে হযরত উমর (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাদের সবাইকে হত্যা করার আবেদন করে বলেছিলেন, আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিকটাত্মীয়কে হত্যা করবে। এ বদর যুদ্ধেই এক আনসারী হযরত মুসআব ইবনে উমায়েরের আপন ভাই আবু আযীয ইবনে উমায়েরকে পাকড়াও করে বাঁধছিলেন। তা

দেখে হযরত মুসআব চিৎকার করে বললেন ঃ বেশ শক্ত করে বাঁধো। এর মা অনেক সম্পদশালিনী। এর মুক্তির জন্য সে তোমাদেরকে অনেক মুক্তিপণ দিবে। একথা শুনে আবু আযীয বললোঃ তুমি ভাই হয়ে একথা বলছো? জবাবে হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের বললেন ঃ এ মুহূর্তে তুমি আমার ভাই নও, বরং যে আনসারী তোমাকে পাকড়াও করছে সে আমার ভাই। বদর যুদ্ধেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামাতা আবুল আস বন্দী হয়ে আসলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামাতা হওয়ার কারণে তার সাথে অন্য সব কয়েদী থেকে ভিন্ন বিশেষ কোন সৌজন্যমূলক আচরণ করা হয়নি। খাঁটি ও নিষ্ঠাবান মুসলমান কাকে বলে এবং আল্লাহ ও তাঁর দীনের সাথে তাদের সম্পর্ক কি এভাবে বাস্তবে তা দুনিয়াকে দেখানো হয়েছে।

দায়লামী হযরত মুয়ায থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ দোয়াটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

اللهم لا تجعل لفاجر (وفى رواية لفاسق) على يدا ولا نعمة فيوده قلبى فانى وجدت فيما او حيت الى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله -

"হে আল্লাহ আমাকে কোন পাপী লোকের দ্বারা (অপর একটি বর্ণনায় আছে ফাসেক) উপকৃত হতে দিও না। তাহলে আমার মনে তার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হবে। কারণ, তোমার নাযিলকৃত অহীর মধ্যে আমি একথাও পেয়েছি যে, আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণকারী লোকদেরকে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে না।"